# স্বাধীন বাঙলা

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

মূল্য এক টাকা ]

বর্ম্মন পাবলিশিং হাউস
১৯৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায়
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা



প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ
প্রকাশ প্রেস
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৩৪

# উৎসর্গ

স্বাধীন বাঙলাকে সম্ভব করিয়া তোলাই যাঁহাদের জীবন-ব্রত, যাঁহাদের নব-ধর্ম্ম, নব-সাধনা—তাঁহাদের উদ্দেশে "স্বাধীন বাঙলার কথা" উৎসর্গ করিলাম।

পিতৃপক্ষ
আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল
বর্দ্ধমান

গ্রন্থকার

# ধ্যান !

স্বাধীন বাঙলার রূপ ধ্যান করি, স্বাধীন বাঙলার কথা জপ করি, স্বাধীন বাঙলার ভাবনায় সমাহিত হই, স্বাধীন বাঙলাকে সম্ভব করিতেই জীবনের প্রতি রক্ত-বিন্দুটি নিঃশেষ করিতে চাই।

অতীতে স্বাধীন বাঙলা ছিল, আবার স্বাধীন বাঙলা হইবে। ইহা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস নহে—ইহা বিশ্বাস।

স্বাধীন বাঙলার কথা আজ ভাবি কেন? শুধু কি আশ্বাস! একটা সুমধুর কল্পনা! পরাধীনতার দুশ্ছেদ্য বন্ধনে পীড়িত হইতে হইতে কল্পনার স্নিগ্ধ প্রলেপে ব্যথিত চিত্তকে শান্ত করা—তাহা নহে!

ভাবনার অনুরূপ সিদ্ধি; তাই এত করিয়া স্বাধীন বাঙলার কথা কওয়া। আর কহিতেছি যে, যদি স্বাধীন বাঙলার সুমধুর নাম শুনিতে শুনিতে বর্ত্তমানের পরতন্ত্র বাঙালীর প্রাণ স্বাধীন বাঙলার জন্য আকুল হইয়া ওঠে!

বাঙালীর ভাবনায় ব্যাভিচার আসিয়াছে। সে আর নিজের কথা ভাবে না, ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাকে বাঁচিতে হইলে আবার নিজের কথা নূতন ছন্দে ভাবিতে হইবে। এই ভাবনা হইবে আশা উজ্জ্বল, জয়-গুর্ব্বী, সৃষ্টি-কামী।

বর্ত্তমানের বাঙলা পরতন্ত্র, পরভাব-ভাবিত। এই অবস্থা একান্ত অস্বাভাবিক। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

মৃত্যু চাহিনা; পরন্তু—চাহি জয়। তাই এই নাগপাশ বন্ধনের মধ্যেও স্বাধীনতার কথা কহিতেছি।

পরাধীনতায় দেহকেই শুধু বাঁধেনা, মনকে একবারে চাপিয়া, পিষিয়া, সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই মৃত্যু-পন্থী অবস্থার একমাত্র প্রতিকার-স্বাধীনতার সঞ্জীবনীতে চিত্তকে ওজস্বী করিয়া তোলা।

স্বাধীন বাঙালা ছিল, ইহা বিস্মৃত হইলে, স্বাধীন বাঙলা প্রতিষ্ঠার ভরসা জাগিবে না। এইজন্যই আজ পরাধীনতা-পিষ্ট বাঙালীর মনের কাছে স্বাধীন বাঙলার শোভনীয় ও মহনীয় চিত্রগুলি প্রস্ফুট করিয়া দেওয়া।

বাঙলা স্বাধীন ছিল! সে স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্যও ছিল অনুপম, অতুলনীয়। স্বাধীন বাঙালী বলবীর্য্যে ছিল দুর্জ্জয়, ধর্ম্মে ছিল উদ্ভাসিত, সমাজে ছিল সুশৃঙ্খলিত, অন্তরে ছিল দেবতা। আজিকার বাঙালী সে দিনের বাঙালীর জীবন-সাধনায় দীক্ষিত হইলে, সেও তেমনি হইবে।

আজিকার বাঙালী আত্মবিস্মৃত। এই আত্মবিস্মৃতিই তাহাকে জীবন্মৃত করিয়াছে। আবার বাঙালীকে জাগ্রত হইতে হইলে তাহার যাহা নিজস্ব, তাহার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। সেই আত্মজ্ঞানের জন্যই "স্বাধীন বাঙলার" কথার অবতারণা।

---

# স্বাধীন বাঙলার কথা

## স্বাধীন বাঙলা কি?

স্বাধীন বাঙলা কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস নহে; পরন্তু বাঙলার এবং বাঙালীর স্বস্থ অবস্থার ঐতিহ্য। আর এই কথা কেবল কোন শিলালেখ, তাম্রলিপি, কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিতেই আবদ্ধ নহে বা লিপিবদ্ধ নাই। ইহা আছে বাঙলার বিগত ধর্ম্মজীবনে, অতীতের পদ্ধতি প্রথায়, উৎসব অনুষ্ঠানে, ভিখারী বাউলের গানে এবং ব্রত নিয়ম, পূজা পার্ব্বণে। সেই সব অবলম্বন করিয়াই স্বাধীন বাঙলার কথা বিবৃত করা হইল। ইহা কল্পনাও নহে, আবার একান্ত বাস্তবও নহে; বাস্তবের কঙ্কাল লইয়া, কল্পনার মাধুরী মিশাইয়া স্বাধীন বাঙলার রূপ দান করিতে চাই।

বাঙলার একটী নিজস্ব রূপ আছে—একটী অন্তরঙ্গ ভাব আছে—একটী একান্ত অমিশ্র ও অকৃত্রিম বৈশিষ্ট্য আছে—সেই একান্ত অবিমিশ্র বাঙলার বিশিষ্ট ভাবাদর্শ ও কর্ম্মপদ্ধতির কথাই বলিতে হয়। যে সভ্যতা-শিক্ষা, যে ধর্ম্মনীতি, যে আদর্শ শুধু নিজস্বতার আলোকে প্রস্ফুট হয়, যাহাতে কেবল আপনার অন্তরের ধ্বনিই প্রতিধ্বনিত হয়—তাহাই স্বাধীনতার অবস্থা।

বাঙলার এমনই একটী স্বাধীন যুগ ছিল। রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এবং অধীনতার মধ্যেও বাঙালীর স্বভাবটী আত্ম-স্বাতন্ত্র্যে অক্ষুণ্ণ ছিল। একটী সুদীর্ঘ যুগ ধরিয়া বাঙালী জাতি ধর্ম্মসাধনে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, সমাজ-বিন্যাসে নিজেকে এমন অপূর্ব্ব ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহা মানব জাতির একান্ত অধ্যয়নযোগ্য বস্তু। বাঙলার এই স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন যাপনাপ্রণালী এমন সহজ ও স্বভাব সঙ্গত ভাবে গঠিত হইয়াছিল, যে উহা প্রত্যেক জাতিরই অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা, মানবজাতির এমনই একটি ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। উহা কিন্তু সর্ব্বাংশে সত্য নহে। রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য না রহিলেও

স্বাধীনতা অটুট রহিতে পারে। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা কেবল শারীরিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, এমন নহে। স্বাধীনতা কিন্তু আত্মিক ঐশ্বর্য্য। উহা দৈহিক বলবত্তার তেমন অপেক্ষী নহে। সংগ্রামে পরাভব ঘটিলেও জাতি স্বাধীন রহিতে পারে। অন্তরে যিনি শূর, কারাকক্ষের পাষাণ প্রাচীরের অভ্যন্তরেও তিনি গগনচারী বিহঙ্গমের অপেক্ষা মুক্ত। আত্মায় মুক্তির অনুভূতি রহিলে বাহিরে কোন বন্ধনেই তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।

তাহার পর রাষ্ট্রীয় অধীনতা কেবলই জাতির দুর্ব্বলতায় নহে, উহা নানা কারণে ঘটিতে পারে। শত্রুর সংখ্যাধিক্য, অস্ত্র শস্ত্রের প্রাচুর্য্য ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং ছল বল কৌশল। ইতিহাসে ইহার অজস্র প্রমাণ আছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। • • •

দ্বিতীয় কথা—অন্তর-স্বাধীনতা রহিলে যে সব সময়ে শত্রু বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না, বরং বিজিতই অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়, ইতিহাস তাহারও সাক্ষ্য দেয়। শক-হুন ভারত আক্রমণ করিয়া, পরিশেষে ভারতের সভ্যতায় দীক্ষা লাভ করিয়া, পরাজিত ভারতের নিকট আত্মসমর্পণে আত্মবিলোপ করিয়াছে—ইহাই পরাজয়।

ভারতে রাষ্ট্র-অধীনতার কালে হয়তো কোন বৈদেশিক নৃপতি সিংহাসন অধিকার করিয়া কর সংগ্রহ করিতেছে —শাসন করিতেছে, ক্ষাত্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমস্ত দেশের কর্ম্মশক্তিকে খর্ব্ব করিতেছে; কিন্তু তাহা জাতির প্রাণকে আক্রান্ত করিতে পারে নাই; অর্থাৎ শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই, সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই, ধর্ম্মকে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হয় নাই; উহা তাহার সনাতন জীবনধারার অনুকূল প্রবাহেই প্রবাহিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রের আক্রমণ একটি সাময়িক উপদ্রবের মত ঘটিয়া গিয়াছে। ঝটিকার অন্তে প্রকৃতি যেমন পূর্ব্বশ্রীতে প্রকাশিত হয়, এই সব বিপ্লবের পর দেশও তেমনি শান্ত ও সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কোন্ দেশে এমন হউক বা না হউক, ভারতে ইহা হইয়াছে। কাজেই বাঙলায়ও রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে এই মানসিক মুক্তির ব্যাঘাত কখনও ঘটে নাই। বাঙলায় শরীরের শাসন যে খুসি করুক, মনের আধিপত্য তাহার অন্তর্দ্দেবতাই করিয়াছেন। এই আত্ম-অধীনতার কালটাই বাঙলার স্বাধীনতার কাল। আর এযুগের জীবনকাহিনীই স্বাধীন বাঙলার কথা। এসময়ে সিংহাসনে হয়তো মোগল বা পাঠান উপবিষ্ট ছিল; রাজনৈতিক

বিচারে উহা হয়তো অধীনতার কাল ; কিন্তু সত্য সত্য উহা মুক্তির অবস্থাই প্রমাণিত করে। আত্মা যতক্ষণ নিরাময় থাকে, বাহিরের বিরুদ্ধ ঘটনায় ততক্ষণ কিছুই করিতে পারে না।

বাঙলার এই স্বাধীন যুগের সমগ্র সমাজ-জীবনের এমন একটী বিশিষ্ট ভঙ্গিমা ছিল, যাহা শুধুই সকল হইতে বিভিন্ন ছিল না, পরন্তু এমন মহিমাময় ছিল, যে তাহার স্পর্শে জীবন অমৃতময় হইয়া যায়। তাহার ফলে—সমাজে শান্তি আসে ও অভ্যুদয় হয়।

স্বাধীন বাঙলার কথায় বাঙলার সেই মহিম্ন যুগের শিক্ষা, জনশিক্ষা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, তপঃশক্তি—এক কথায় সমস্ত জাতির জীবন-কথাই আলোচিত হইবে।

——— • • •

## স্বাধীন বাঙলার গণশিক্ষা

স্বাধীন বাঙলার যে কোন কথাই বলা যাউক, তাহা তুলনায় আলোচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমানের সঙ্গে উহার একটা তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া উহার ভালমন্দ বোঝা যাইবে না। এখন যাহা আছে, তখন কি ছিল—তখন কি ভাল ছিল, এখন কি ভাল , তখন কি ছিল না, এখন কি নূতন, সে কথাও বলিতে হইবে ;

এবং সে সকল আলোচনার পূর্ব্বেই শিক্ষার অবতারণা করিতে হইবে। কারণ শিক্ষার আদর্শ, প্রসার ও প্রকৃতিতে জাতীয় চরিত্রটি অধ্যয়ন করিবার সুবিধা হয়। তাই সর্ব্বাগ্রে গণশিক্ষার কথাই বিবৃত হইতেছে।

শিক্ষা জাতির আধ্যাত্মিক আহার্য্য। শিক্ষাতে জাতি-চরিত্রের বলাধান করে। যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হইয়াছে, তাহারা ততখানি সভ্য এবং বলবীর্য্যসম্পন্ন।

একটী জাতি বা সমাজের ভিতর দুই প্রকার শিক্ষানুষ্ঠান চলিতে পারে বা চলে। সমাজের মধ্যে প্রধানতঃ—দুইটি বিভাগ—অভিজাত এবং জনসাধারণ। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির মধ্যে প্রধানতঃ এই অভিজাত শ্রেণীই শিক্ষা পাইয়া থাকে। জনসাধারণ শুধু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের মত খাটিয়া যায়, বিদ্যা বা জ্ঞানের বড় চর্চ্চা করে না, কিম্বা করিবার তেমন সুবিধা পায় না।

ভারতে জ্ঞানকে মানবজীবনের চরম সাধ্য বলিয়া স্বীকার করায়, শিক্ষা মানবতার অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে মানুষকে বাঁচিতে হইলে জ্ঞানকে এড়াইয়া চলিলে চলিবে না। সর্ব্ব-শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত হইতে হইবে। মস্তিষ্কজীবিও জ্ঞানের সাধনা

করিবেন, শ্রমিকও বিদ্যালাভ করিবেন। পার্থক্য কেবল বিদ্যালাভের পদ্ধতিতে।

অভিজাত শ্রেণী—বা যাঁহাদের শারীরিক শ্রমে জীবিকার্জ্জন করিতে হয় না, তাঁহাদের শিক্ষার একটি পদ্ধতি আছে, উহা লেখা ও পড়া। এখানে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহারা লিখিতে পড়িতে সুযোগ পায় না, যাহাদের দিবসের অধিকাংশ সময়ে হল চালনা করিতে হয়, কাঠ ও মাটি কাটিতে হয়, নানাবিধ শ্রমসাধ্য কাজে সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহাদের শিক্ষার কথাই আলোচিত হইবে।

অভিজাত শ্রেণীর লেখাপড়া যেমন নিতান্ত কর্ত্তব্য —জনগণের যেন তেমন নহে, এমনই একটা ধারণা আছে। তাই যাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে বিদ্যালাভ সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য তাঁহারা জনগণের শিক্ষার প্রয়াসে অভিজাত শ্রেণীর অনুকরণে বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। দিনে কাজের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া, রাত্রে এইসব শ্রমজীবি-পাঠশালায় পঠন পাঠন হয়। ইহারই নাম শ্রমজীবি নৈশ-বিদ্যালয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ব্বে, এমন কি বিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাঙলায় নৈশ-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। কোন

পাঠশালায় বসিয়া বই কাগজ কলম লইয়া লেখাপড়ার বিশেষ ব্যবস্থা রাত্রে বা দিনে কখনই ছিল না। এজন্য মনে হইতে পারে, বাঙলা গণশিক্ষায় অনভিজ্ঞ ও উদাসীন।

বাস্তবিক তাহা নহে। বাঙলায় গণশিক্ষা ছিল এবং বিশেষভাবেই ছিল। তবে উহা তাহার নিজের মতই ছিল; এবং উহা নিজের মত ছিল বলিয়াই, অন্যের সাথে মিলে না বলিয়াই অপরে বাঙলায় গণশিক্ষা ছিল না বলিয়া অপবাদ দেয়।

যে দেশে "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" পরম বাণী, সে দেশে মানুষকে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন রাখা অধর্ম্মের অপেক্ষাও অকর্ত্তব্য। তবে এদেশে বিদ্যা দানের পদ্ধতিটি একটি বিশেষ পদ্ধতি। উহা কাহারও সহিত মিলে না, এ দেশের অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গেও নহে, ও দেশের কাহারো সহিতও নহে। উহা লেখাও নহে—পড়াও নহে।

এদেশে জ্ঞানলাভের একটা নিজস্ব পদ্ধতি ও আদর্শ ছিল। উহাতে লেখাপড়ার তেমন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। লেখাপড়া না করিলেও জ্ঞানলাভ হয়, ইহাই ভারতবর্ষীয় ধারণা। লেখা পড়াটা এখানে জ্ঞানলাভের একটি অন্যতম উপায় মাত্র, উহা একমাত্র পন্থা নহে।

আর এখানে বিদ্যার আদর্শ কেবল তত্ত্ব তথ্য নহে, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতি।

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন এদেশে সর্ব্বজনমান্য জ্ঞান-লাভ পদ্ধতি; যে জ্ঞানার্থী—বিদ্যালাভে যাহার ঐকান্তিক আকাঙ্খা আছে, সে জ্ঞানের বিষয় শুনিয়া, উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, উহাকে অন্তরস্থ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে। এদেশে আবশ্যক উপদেশ। উপনিষদ হইতে গীতা পর্য্যন্ত যাবতীয় জ্ঞানবাক্য গুরু মুখে বলিয়াছেন, শিষ্য তাহা কাণে শুনিয়া অন্তরস্থ করিয়াছেন।

সেই ধারাটী—সেই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন বাঙলার শিক্ষাপদ্ধতিতে, বিশেষভাবে গণশিক্ষা-প্রণালীতে অনুস্যূত হইয়াছিল। লেখাপড়া যে করিতে পাইত সে করিত; যাহার সে অবসর ছিল না, সে যাত্রায়, গানে, কথকতায় নানা উপদেশ পাইয়া, শিক্ষা পাইয়া, শিক্ষার যাহা সার তাহাই লাভ করিত।

বর্ত্তমানে শিক্ষাটা অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখন লেখাপড়াই একমাত্র শিক্ষা, যে লিখিতে পড়িতে জানে সেই শিক্ষিত। এ উপায় ভাল কি মন্দ তাহার আলোচনা অন্যত্র হইবে। কথা হইতেছে, যে লেখাপড়া

ব্যতীতও শিক্ষা হয়। আর বাঙলার গণশিক্ষায় সেই লেখাপড়া বিহীন প্রণালীই প্রবর্ত্তিত ছিল।

মানুষ প্রধানতঃ দেখিয়া শেখে। তাহার পর সে শুনিয়া শেখে। শুনিয়া শেখা—পড়িয়া শেখারই প্রায় অনুরূপ। প্রভেদ—একটায় নিজের শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়,অন্যটিতে অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী হইতে হয়। ফলে কিন্তু খুব বেশী প্রভেদ হয় না।

এখন শিক্ষার কথা। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চারিত্রিক বিকাশ। সাধারণ জীবনকে অসাধারণ জীবনের অনুসরণে অনুপ্রাণিত করা, সামান্যকে মহত্ত্বে মণ্ডিত ও উদ্ভাসিত করা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। শুধু কতকগুলি তত্ত্ব, তথ্য, রহস্য, ইতিবৃত্ত, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি শেখানো বা শিখিয়া যাওয়া শিক্ষার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা।

লেখাপড়া না শিখিয়াও এই চারিত্রিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। প্রাচীনকালে গুরু-শিষ্যের কথোপকথনে ইহা প্রচলিত ছিল। সক্রেটিসের সময় ইউরোপেও এই প্রথা চলিত। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে। অধ্যাপক ও প্রচারকের বক্তৃতা, আচার্য্যের উপদেশ এসকলই সেই মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া।

ইহাতে লেখাপড়ার আবশ্যক হয় না। কেবল পণ্ডিতের কাছে যাহা জটিলভাবে ব্যাখ্যাত হয়, সাধারণের কাছে তাহা সরলভাবে কথিত হয়।

বাঙলায় জন সাধারণের মধ্যে যে আক্ষরিকতা ছিলনা এমন নহে; উহার প্রাধান্য ছিল না। কারণ আক্ষরিক শিক্ষায় সুবিধা যেমন, অসুবিধা তাহার অপেক্ষা কম নহে। ঠিক ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের বিধান মত অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থীর মত না চলিলে আক্ষরিক শিক্ষায় মানুষকে অনেকটা শক্তিহীন অক্ষম করিয়া তোলে। খাটিবার, জীবনযুদ্ধে বীরের মত সংগ্রাম করিবার, একটা কিছু নির্ম্মাণ করিয়া ঝঞ্ঝার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সামর্থ্য তাহার চলিয়া যায়। আমাদের দেশে ইহা ঘটিয়াছে, ইউরোপেও ঘটিতেছে। জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থী না হইলে, কেবল অবশ অপ্রবুদ্ধ আকাঙ্খার বশে চলিলে এমনই হয়।

শিক্ষা-বিজ্ঞানের আলোচনা বক্ষ্যমান বিষয়ে আবশ্যক হইবে; তবে ততটা বিস্তৃতভাবে নহে। এখন প্রধান কথা, বাঙলার গণশিক্ষা কেমন ছিল তাহাই অনুসন্ধান করা।

স্বাধীন বাঙলায় প্রত্যেক মানুষটিকেই শিক্ষা দেওয়া

হইত, এবং সে শিক্ষা প্রধানতঃ চারিত্রিক শিক্ষা। যাহাতে মানুষ মানুষ হইতে শেখে, অর্থাৎ পবিত্র চরিত্র হইতে শেখে—ত্যাগ করিতে শেখে, পরের জন্য কাঁদিতে, ভাবিতে এবং সত্যব্রতী হইতে অভ্যাস করে। এখন দেখা যাইতেছে, আক্ষরিক শিক্ষায় সম্পূর্ণ কৃতী হইয়াও মানুষের মনুষ্যত্ব পরিপুষ্ট হইতেছে না, বরং হ্রাস পাইতেছে। আর যখন এই লেখাপড়া-মূলক শিক্ষা ছিলনা, তখন বাঙলায় কতখানি মনুষ্যত্ব ছিল, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী।

যাহা হউক, স্বাধীন বাঙলার গণশিক্ষা ছিল এবং ব্যাপক ভাবেই ছিল। তখন সমাজে নানা উৎসব প্রচলিত ছিল এবং সেই সব উৎসব নানাপ্রকার পৌরাণিক ঘটনার সুমহান ইতিবৃত্ত লইয়া। এইসব উৎসবে যে যাত্রাগান ও কথকতা হইত, যাহাতে সাক্ষর নিরক্ষর নির্ব্বিশেষে আত্ম-ত্যাগ, মহত্ত্ব, শৌর্য্য ও বহু প্রকারের পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া সেইভাবে প্রবুদ্ধ হইত।

শুধু ইহাই নহে—বৈরাগী নিত্য যে গান গাহিয়া বেড়ায়, ভিক্ষুক যে সুরে ভিক্ষা চায়, এক একটি পার্ব্বণেও মেলায় যে কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, তর্জ্জা হয়,

তাহাতে জাতি-সাধারণ একটি উদার শিক্ষায় অভিষিক্ত হইত।

এই যে গানের সহিত—নাট্য ও সঙ্গীতকলার সহিত শিক্ষার প্রচার, ইহা শিক্ষা-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি। ইহার আকর্ষণ অতি প্রবল, ইহার প্রভাব অমোঘ।

স্বাধীন বাঙলা শিক্ষায় তাহার সারা জীবনটাকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল; কারণ, জ্ঞানকে যে প্রাণের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া লইতে হয়। নহিলে বিস্মৃতি আসে, মোহ-ভ্রান্তিতে সত্যকে ভুলিয়া যাইতে হয়। যে তপস্যায় জ্ঞান জীবনের সহিত অচ্যুত সংলগ্ন থাকে, সাধারণ মানুষের তাহা নাই। সেই জন্য আহারে, বিহারে, কর্ম্মে, বিশ্রামে, উৎসবে, দুর্দ্দিনে সত্যকে জপ করিতে হয়। বাংলার গণশিক্ষায় এই জপের পদ্ধতি ছিল। দিবসে বৈরাগী বাউল গান করিতেছে—গৃহস্থের দুয়ারে, হাটুরিয়ার হাটের মাঝে, দোকানির কেনাবেচার সামনে, খাজনাখানার সম্মুখে, গৃহকর্ম্মরতা কুলাঙ্গনার কর্ম্মব্যস্ততার নিকটে, এই গানের ভাবে ও সুরে মাটিতে ছড়ান মনটা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, যে মন স্বার্থে সঙ্কীর্ণতায় পাশবতার সহস্র বন্ধনে বদ্ধ

ছিল, তাহা ঐ বৈরাগী বাউলের সঙ্গীতে মুক্তির আনন্দে মাতিয়া ওঠে। এই সব গান মূঢ়কে মহৎ করে, ভ্রান্তকে পথ দেখাইয়া দেয়। ইহা বাঙলার একটি শিক্ষা প্রকরণ।

বাঙলার গণশিক্ষায় কেবল এই একটি মাত্র পদ্ধতিই ছিল না, স্বাধীন বাঙলা তাহার সমাজকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করিয়াছিল, যাহাতে জ্ঞান লাভের সহস্রবিধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত ছিল।

বাঙলার পূজা-পার্ব্বণ আর একটী শিক্ষণীয় ব্যাপার। 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ' আছে। প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণের পিছনে এক একটি মহিমাময় পৌরাণিক কাহিনী বিজড়িত। ইহা সমাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে বিমিশ্র আছে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ-টিকেই উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে—একটি পুণ্য স্পর্শে পবিত্র করিয়া দেয়।

এই সব পূজা-পার্ব্বণের আর একটা বিশেষ শক্তিশালী প্রভাব আছে। ইহা কোন না কোন শিল্প-কলাকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সেই সব মূর্ত্তি ও প্রতিমা ভাস্কর শিল্পীর হাতে পড়িয়া এমন আকার ধারণ করে, যাহাতে অতি বড় ভাবহীনের

গভীর ভক্তি শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। এই সব পূজার আয়োজন নিত্য নহে, নৈমিত্তিক। আবার মন্দিরে নিত্য যে বিগ্রহ সম্পূজিত হন, তিনি অন্যতম জ্ঞান উৎস। প্রত্যেক পল্লীর গ্রাম্য-দেবতার ত্রিসন্ধ্যায় আরতি বোধনের বাদ্যধ্বনিতে বিস্মৃত মানবকে প্রতিদিনকার বিস্মৃতি হইতে জাগরিত করিয়া দেয়। আবার এই মন্দিরে বেদ পাঠ হইতেছে, শাস্ত্র ব্যাখ্যা হইতেছে, কথক ঠাকুর সুললিত কণ্ঠে নিতান্ত সহজ করিয়া মহিম্নকাহিনীগুলি বিবৃত করিতেন। কীর্ত্তনীয়া আসিয়া কীর্ত্তনের সুধাধারায় জনসাধারণকে স্নিগ্ধ করিতেছেন; কেহ মঙ্গল কামনায় সমারোহ করিয়া দেবতার কাছে পূজা দিল, অজস্র দান ধ্যান করিল, মন্দিরে কোন সাধু সন্ন্যাসী আসিলেন, এ সবই সাধারণ চরিত্রের উপর প্রভাব ফেলিয়া যায়, এসকলই এক একটী শিক্ষার অঙ্গ।

ইহার পর বারোয়ারী। বারোয়ারী সামাজিক আনন্দের ব্যাপক অনুষ্ঠান। ইহাতে কোন ব্যক্তিগত ইচ্ছার ও মনের ঠাঁই নাই, পরন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিটীর ইচ্ছায় ইহার অনুষ্ঠান। এই বারোয়ারী নিষ্ফল আমোদ প্রমোদ নহে, কেবল মাত্র বিলাসের উপভোগ্য

নহে, বারোয়ারীতে শিক্ষা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ। ইহার কেন্দ্রস্থলেও কোন দেবতা আছেন। কাজেই ইহার মাঝেও একটী শুদ্ধির ভাব জাগরূক থাকে। এজন্য দেবতাকে পুরোভাগে রাখিয়া যে উৎসবের আয়োজন, তাহাও পুণ্যময়—কতকটা সংযত, সংহত, কতকটা পাবনীশক্তিযুক্ত।

এখন যেমন থিয়েটার বায়স্কোপ লোকের প্রমোদের অনুষ্ঠান, তখন যাত্রা গান কথকতা কবি পাঁচালী তর্জ্জা প্রভৃতি ঐ চিত্তবিনোদনের অবলম্বন ছিল। থিয়েটার প্রভৃতি দেহসর্ব্বস্ব, অনেকটা প্রবৃত্তিপ্রধান কারুকলা; আর যাত্রা প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ। এসবের আনন্দ শুধুই ব্যসন নহে, ইহা আনন্দের সহিত শিক্ষা—শিক্ষার সহিত আনন্দ।

ইহা ছাড়া আরও ছোট ছোট বারোয়ারী ছিল। ধনী নির্ধন প্রায় সকলেই জন্মোৎসবে, বিবাহে, উপনয়নে গৃহস্থের কোন কিছু শুভ কর্ম্ম উপলক্ষে, কিম্বা জন কয়েক মিলিয়া একটু আসর উপভোগের জন্য পাড়ায় অথবা কাহারো বাড়ীতে কবি, পাঁচালী প্রভৃতির আসর বসাইত। শিক্ষার শিকড় এমনি করিয়া জাতির সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই গণ-শিক্ষার আর এক সহায় ছিলেন তখনকার সাহিত্যাচার্য্যগণ। তাঁহারা এমন লোকায়ত মহিম্ন ভাবপ্লুত কাব্য নাটক কাহিনী, গাথা গীতি রচনা করিতেন যাহাতে জনসাধারণ মাতিয়া উঠিত। এক একজন সাহিত্যিকের মনীষা জনসমাজের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিত। উদাহরণ স্বরূপ মনসা-মঙ্গলকে ধরা যাউক। মনসার ভাসান, এমন পল্লী নাই যেখানে গাওয়া হয় নাই; অন্ততঃ ২০০।৩০০ শত বছরের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ হাজার বার গাওয়া হয় নাই! মনসা-মঙ্গল যে কত কবির লিখিত এবং অলিখিত আছে, তাহার সঠিক হিসাব নাই; মোটের উপর বাঙলার প্রত্যেক প্রদেশে ও পল্লীতে উহার প্রচলন আছে। ফল হইয়াছিল, বেহুলার পাতিব্রত্য বাঙলার নর নারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। এখনকার কোন কাব্য নাটকে এমন হয় নাই। কারণ এ সাহিত্য লোক-সাহিত্য নহে; শিক্ষার সাহিত্য নহে। ইহা জন-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়াছে, এমন কি অস্পৃশ্য করিয়াছে বলিলেই ভাল হয়। তখনকার অস্পৃশ্যতা ছিল দেহের সহিত দেহের, এখনকার উহা প্রাণের সহিত প্রাণের। তখন-কার সাহিত্যিক ধর্ম্মবেত্তা সমাজপতি জাতির হৃদয়টী

স্পর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, আর বর্ত্তমানের ইঁহারা জনগণের দেহটা একটু ছুঁইতেছেন মাত্র—সেও মৈত্রীর আবেগে নহে—কৃপার বশে, নিজেদের দাসত্বে নিয়োগ করিবার জন্য। ইঁহারা নিজেদের জন্য একটা ললিত, কারুতাপূর্ণ সাহিত্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া জনগণের জন্য কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দুখানি ভাঙ্গাবেঞ্চি ও চেয়ার দিয়া "অনুশোচনা অকুতোভয় পারলৌকিক কুজ্ঝটিকার" সাহিত্য ও শিক্ষার রচনা করিয়া গণ-শিক্ষার গর্ব্ব করিতেছেন।

আর সে-কালের উৎসব আনন্দ—আলোকমালা ঝলকিত বারোয়ারীতলা এবং সেখানে কাঠুরিয়া হইতে জমিদার পর্য্যন্ত এক ক্ষেত্রে অবাধ সম্মিলন—উচ্ছ্বসিত পুণ্য কথায় শিক্ষা লাভ।

এখন নৈশ বিদ্যালয়ে ছাত্র হয় না, হইতে বিরক্তি প্রকাশ করে। আর তখন দেবমন্দির হইতে প্রমোদাগার, শ্রমিকের কর্ম্ম-মুখর কর্ম্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত স্বাভাবিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। আর সেখানে অবাধে অধীর উল্লাসে শিক্ষা পাইয়া ধন্য হইত। বই পড়া নয়, কিছু মুখস্থ করা নয়—মানুষ হইয়া উন্নত, উন্নত চরিত্র হইয়া ধন্য হইত, জাতিকে ধন্য করিত। স্বাধীন

—সে-কালের বাঙলায় আর এ-কালের সমুন্নত বাঙলায় ব্যবধান কতখানি!

স্বাধীন বাঙলার মাণ্ডলিকগণ শিক্ষার অন্যতম উৎস ছিলেন। তাঁহাদের সহৃদয়তা, চরিত্রবত্তা উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে হিতাকাঙ্ক্ষা মানুষকে সহজেই পুণ্যবত্তার দিকে আকৃষ্ট করিত। এই সব সমাজপতি যখন সন্ধ্যায় বিশ্রাম কালে চণ্ডিমণ্ডপে বসিয়া শাস্ত্র পাঠ ও নানা সৎ-কথার আলোচনা করিতেন, পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করিতেন, তখন পল্লীর আপামর সাধারণ শ্রদ্ধায় সেই সব শুনিয়া যাইত। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"; এই শ্রদ্ধা তাহাদিগকে পণ্ডিত না করুক, জ্ঞানী করিত— অবশ্য এ জ্ঞান পবিত্রতার জ্ঞান।

প্রচলিত শিক্ষার ধারণা মনে রাখিয়া বাঙলার জন-শিক্ষার পরিচয় লইলে চলিবে না, ইহাতে শিক্ষার ব্যাপক ও গূঢ় ভাবটীকে ধরিতে হইবে। পড়াশুনা ব্যতীত মনুষ্য জীবনের বহু শিক্ষা ও শিক্ষণীয় আছে। সে সব হয় কেবল দেখিয়া শুনিয়া এবং ইহাই শিক্ষার প্রধানতম পদ্ধতি। বাঙলার শিক্ষায় এই প্রথাই ছিল প্রধান।

সেইজন্য মেলাগুলিকে আর একটি প্রভাবশালী শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া ধরিতে হইবে। এখনকার মেলা

আর তখনকার মেলা এক নহে। সেদিনের মেলাগুলিও পূজার মত দেবপ্রধান অথবা কোন সাধু সন্তের আবির্ভাব তিরোধানে প্রবর্ত্তিত। কাজেই উহাও সেই ধর্ম্মভাবপুষ্ট। এই মেলাগুলি শুধুই প্রদর্শনী (Exhibition), বণিক্‌বৃত্তি অথবা প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য নহে। ইহার প্রধানতম লক্ষ্য সাধু পূজা; আমোদ প্রমোদ পরোক্ষ। এসব পূজার উপলক্ষে সারাজাতি মাতিয়া উঠিত। পূজা ও পবিত্রতা ছাড়া উন্নততর আনন্দ মনুষ্যজীবনে আর কি থাকিতে পারে? স্বাধীন বাঙলার এই মেলাগুলি জনসমাজকে মায়ের মত আদরে সোহাগে তাহার কোলে টানিয়া আনিয়া, পুণ্যপ্রবণ আনন্দের স্তন্যধারায় পরিপুষ্ট করিত। দশটা বিদ্যালয়ে দশ বছরে যাহা না হয়, এই এক একটি মেলায় তাহা অনায়াসে সফল হইয়া যাইত।

এই সব প্রধান প্রধান বিষয় ছাড়া মণ্ডলী, গোষ্ঠী, বংশ, সম্প্রদায় প্রভৃতির ভিতর কত যে শিক্ষণীয় ব্রত পূজার প্রচলন ছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এমনি ভাবেই স্বাধীন বাঙলার গণশিক্ষা বটবৃক্ষের মত বহু পল্লবিত হইয়াছিল।

স্বাধীন বাঙলায় গণশিক্ষা যাঁহারা ছিল না বলেন,

তাঁহারা বাঙলার বিগত যুগের ইতিহাসখানি শ্রদ্ধাভরে একবার আপনার চক্ষে দেখিয়া লইবেন। দেখিবেন—লেখাপড়া হয়তো ছিল না—কিন্তু লেখাপড়ার যাহা চরম ফল—সেই চারিত্রবত্তা—বাঙালী জীবনের সহজ ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল; যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়—সেই শিক্ষাই ছিল।

# স্বাধীন বাঙলার গণ-সাহিত্য

জাতীয় জীবনে শিক্ষা যেমন চাই, সাহিত্যও তেমনি ভাবে চাই। সাহিত্য মার্জ্জিত মনের আনন্দ, অমার্জ্জিত মনের ওজঃশক্তি। জাতি-গঠন ও পরিপুষ্ট করিতে শিক্ষা ও সাহিত্য রথি এবং সারথি। অনেক সময় একমাত্র সাহিত্যই শিক্ষার প্রধান অবলম্বন। এই কারণে সাহিত্যকেও শিক্ষার মত লোকায়ত করিতে হয়. যাহাতে উহা বায়ুর মত সর্ব্বগামী হইয়া সকলের পক্ষে প্রাণপ্রদ হয়। সাহিত্য লোকায়ত না হইলে জাতীয় শিক্ষার শক্তি অথর্ব্ব হইয়া পড়ে। কেন না শিক্ষা কেবল বানান-শব্দার্থ-গণিত-ইতিহাস-ভূগোল নহে, শিক্ষা একটি সমুন্নত আদর্শ। সমুচ্চভাব ও চরিত্র গঠনোপযোগী কতকগুলি মহীয়ান চিন্তা এবং প্রেরণা।

ভারতের সত্য- দ্রষ্টার উপলব্ধি—"আকাশে যদি প্রাণ না রহিত, তবে কেই বা বাঁচিতে চাহিত?" এই প্রাণেরই অপর নাম আনন্দ। যাহা প্রাণপ্রদ, তাহাই আনন্দপ্রদ। এই প্রাণ জীবনী-শক্তি নহে;

ইহা একটি মহিম্নশক্তি—যাহা জীবনকে সামর্থ্য দান করে—জীবনী-শক্তি সঞ্জীবিত করে। যে রসে, যে চিন্তায় এই প্রাণের স্পর্শ রহিয়াছে, তাহাই আনন্দময়। সাহিত্য যে মানুষের আকর্ষণের, তাহার হেতু উহার মধ্য দিয়া প্রাণেরই অভিব্যক্তি হয়। সাহিত্য যদি কেবল বুদ্ধির উপভোগ্য বিষয় হইত, তবে উহা গণচিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। উহা নহে বলিয়াই—স্বাধীন বাঙলায় সে প্রকার সাহিত্য ছিল না বলিয়াই স্বাধীন যুগের বাঙালী বুদ্ধিজীবির সহিত সমানভাবে সহিত্যরস উপভোগ করিত।

সাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ কতকগুলি লিখিত এবং মুদ্রিত পুঁথি পত্রকে বোঝায়। যে যুগের কথা হইতেছে, সে যুগে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। কাজেই, তখনকার লিখিত লোক-সাহিত্য ছিল না বলিলেই হয়, অথচ আদর্শানুযায়ী লোক-সাহিত্য ছিল।

বাঙলার কথা কহিতে হইলে ভারতীয় প্রকৃতির তুলনায় তাহার আলোচনা করিতে হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রুতির মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। যাহা জ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া বিঘোষিত হইত, তাহা জিজ্ঞাসু শিষ্য শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিয়া স্মৃতিতে

গ্রথিত করিয়া রাখিতেন এবং জিজ্ঞাসু পরম্পরায় তাহা প্রচার করিতেন।

ইহা উচ্চাঙ্গের আলোচনা পদ্ধতি। লোকসাহিত্য প্রচারও এই নিয়মে চলিত। দর্শন কাব্য প্রভৃতি লেখা হইলেও, গণ-সাহিত্য লেখা অপেক্ষা, শ্রুতির পদ্ধতিতেই বিশেষ করিয়া প্রচারিত হইত। সাহিত্যিক হয়তো লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রচার হইয়াছে মুখে মুখে—শুনিয়া শুনিয়া।

এই ব্যবস্থার একটা সুবিধা আছে। যাহারা খাটিয়া খুটিয়া জীবন যাপন করে, তাহাদের যেমন লেখাপড়া শিখিবার সুবিধা হয় না, তেমনি বই কিনিবার সামর্থ্য বা অর্থস্বাচ্ছল্যও থাকে না। আজকাল সকলেই বই পড়াইবার জন্য সাহিত্যের সুলভ সংস্করণ (আট আনা বা চার আনা সংস্করণ) তৈয়ারী হইতেছে। কিন্তু উহা যত সস্তাই হউক, সাধারণের যাহা অর্থ-সঙ্গতি, তাহাতে দুই একটা পয়সা খরচ করাও কষ্টকর—উহা ঠিক প্রাণে মরিয়া দেওয়া। এই সুলভ সাহিত্য কেবল মূল্যে সুলভ রহিয়া যায়, চিত্তের কাছে লোভনীয় হয় না, কাজেই যাহাদের জন্য ইহার প্রচলন, তাহাদের বড় কাজে

লাগে না। এই কম দামের সাহিত্য-পুস্তক কেনা হইলেও অনেক সময় পড়িবার সময় থাকে না, আবার পড়িবার ইচ্ছা রহিলেও অনেক ক্ষেত্রে কিনিবার সঙ্গতি থাকে না।

স্বাধীন বাঙলায় সাহিত্য রচনা ও প্রচারের একটি স্বতন্ত্র পন্থা ছিল! পন্থাটী যেমন সহজ ছিল—তেমনই হৃদ্য ছিল। ইহার পরিচয় দিতেছি।

সঙ্গীত, কলা, কাব্য ও নাটক প্রধানতঃ এই ত্রিধারায় প্রাচীন লোকসাহিত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। যে সব পবিত্র উপন্যাস, যে সব সমুন্নত ভাব—যে সকল পৌরাণিক কাহিনী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল, সে সমস্ত হয়তো ভিখারী বৈরাগী, আউল বাউল পল্লীতে পল্লীতে গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইত, না হয়, কবি তর্জ্জা পাঁচালীওয়ালারা আসরে গাহিতেন, অথবা নাট্যাকারে উহা যাত্রায় অভিনীত হইত। এমনি করিয়া সাহিত্যের যাহা উদ্দেশ্য, যাহা বক্তব্য, যাহা দেয়, তাহা সমস্ত জাতির মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত—ধনী—নির্ধন সকলকার মধ্যেই প্রচার হইয়া যাইত। ইহা অপেক্ষা সুলভভাবে সাহিত্য প্রচার আর কি হইতে পারে!

লঘু সাহিত্য বলিয়া—সাহিত্যের একটী বিভাগ আছে; সাধারণে উহা পড়িতে চায়—পড়িতে ভাল-বাসে। কারণ উহাতে কোন গভীর ভাব, উচ্চ আদর্শ থাকে না; থাকে কেবল সাধারণ আমোদ প্রমোদের মত—প্রবৃত্তি-পরায়ণতার উপভোগের মত, বিলাস কলার মত—কতকগুলি নিতান্ত হাল্কা, অগভীর—অনেক সময় দুর্নীতি-মূলকভাব। এ সাহিত্য জাতিকে বলিষ্ঠ করিতে তো পারেই না, উপরন্তু অধঃপাতিত করে। আবার পণ্ডিতসেব্য ও রচিত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও তেমন সহজ বোধ্য হয় না। এ জন্য উহা সুলভ করিলেও, রচনায় সরল করিলেও সাধারণের আকর্ষণীয় হয় না। ইহার হেতু, মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পতনপ্রবৃত্তি আঁছে—তাহাই।

স্বাধীন বাঙলার সাহিত্য—সঙ্গীত ও নাট্যকলার মধ্য দিয়া রূপলাভ করিয়াছিল বলিয়া, উহা সহজেই লোকায়ত হইয়াছিল। তবে—ইহা লঘু হইলেও অসার ছিল না! সঙ্গীতের রসে সিক্ত হইত বলিয়া, এ সাহিত্য সমুচ্চভাব বহন করিয়া আনিলেও সাধারণের কাছে উহা অরুচিকর ছিল না। এইভাবে বাঙলার গণসাহিত্য মহিম-ভাবপ্লুত হইয়া জাতীয়-জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

আবার বাঙলার—স্বাধীন সমাজের এমনই গঠন-প্রণালী ছিল, যাহাতে জাতীয় জীবনের পোষণোপযোগী ভাবাদর্শগুলি—সহস্র উৎসবময়ী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া একান্ত সহজভাবে প্রচার হইয়া পড়িত। বাঙলার ধর্ম্মগত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান রীতিও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

বঙ্গের ধর্ম্মসাধনা এবং সামাজিকতা প্রায় অভিন্ন ছিল। ধর্ম্মাচরণের মধ্য দিয়াই বরং সামাজিকতার প্রকাশ হইয়াছিল, এবং সেই সকল ধর্ম্মচর্য্যা প্রায় অধিকাংশই সমষ্টিগত ছিল। ব্যক্তিগত সাধনার দিকটা সমাজের উপরিভাগে না ফুটিয়া সমাজের অন্তরালে কেবলমাত্র ব্যক্তির অন্তঃক্ষেত্রটিকে আশ্রয় করিয়াছিল। আর এই সামাজিক ধর্ম্মপ্রবণতা সমাজের সর্ব্ব অংশকে সমবেত করিয়া আচরিত হইত। এই সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলিই রথ দোল, স্নানযাত্রা, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি নানা পাল পার্ব্বণের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বারোয়ারী ছিল—ইহার প্রধানতম অঙ্গ। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আরাধনা উপাসনাও সামাজিক হইয়া অনুষ্ঠিত হইত। দুর্গোৎসব বা কোন পূজা অথবা যজ্ঞানুষ্ঠানের মত কোন কাজ

তাহা একের হইলেও দশকে মিলাইয়া লইয়াই প্রতি-পালিত হইত, এবং এই সব পূজা উপাসনা কেবল আরাধনামূলক কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত না; ইহার দুইটা অঙ্গ ছিল, একটায় বিশুদ্ধ অর্চ্চনা—সাধকের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রার্থনার ভাব ছিল, আর অন্যটিতে উৎসবের প্রকৃতি ছিল। সেইটিতে যাত্রা গান কথকতা প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এগুলিও নিছক প্রমোদমূলক নহে। ভারতবর্ষে যে শ্রুতিমূলক জ্ঞানানুশীলন প্রথা ছিল, যাত্রা গান তাহারই একটা অঙ্গবিশেষ। এই সব যাত্রায় গানে ধর্ম্ম ও নীতির কথা মধুর করিয়া বিঘোষিত হইত। এই ভাবে সাহিত্যের দান সমাজের সর্ব্ব অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িত।

সমাজে, যত লোক তত কাজ থাকে না। এ জন্য কতক লোককে বেকার থাকিতে হয়। বাঙলার সমাজপতিগণ এই বেকারদিগকে ভিক্ষুক না করিয়া, দস্যু ও দুর্ব্বৃত্ত হইবার অবসর না দিয়া তাহাদিগকে জাতির একটা প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ করিয়া গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। এই সব কর্ম্মবিহীন লোকগুলি একটি সমাজহিতকর বিশেষ কাজ পাইয়াছিল। উহারা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া বেড়াইত। সে

সব গান সঙ্গীতকলার—কারিগিরি নহে, তাহা সাহিত্য-রসসিক্ত ও সমসাময়িক লেখক মনীষিগণের—চিন্তা এবং ভাবধারা। সেই সব গানে ভক্তি, জ্ঞান, অভয় —জীবনের শিক্ষণীয় এবং সাধ্য বিষয়গুলিই সন্নিবিষ্ট রহিত।

সাহিত্যের রস লোকে পড়িয়া গ্রহণ করে, আবার শুনিয়াও তাহা করা যায়। পড়া ও শুনার অপেক্ষা আর একটি বিষয় অধিক কার্য্যকরী—উহা স্মরণ করিয়া রাখা। এইটাই সাহিত্যের বিশিষ্ট উপযোগীতা। স্বাধীন বাঙলার গণসাহিত্য পড়া তত হইত না, শুনা হইত খুব এবং সেই পরিমাণেই স্মরণ রাখা হইত। যে সব গাথা ও গীতি যাত্রায় ও কথকতায় গীত হইত—ভিখারী বাউল যাহা গাহিয়া বেড়াইত, তাহা অধিকাংশ লোক শুনিয়া শুনিয়া মুখস্ত করিয়া ফেলিত। যাহাদের স্মরণশক্তি প্রখর, তাহারা কেবল শুনিয়াই মনে রাখিতে পারিত, অনেকের অধিকবার শ্রবণ করিয়া আপনা আপনিই অভ্যাস হইয়া যাইত; আর কেহ বা ভিখারী বাউলকে ডাকিয়া পয়সা কড়ি দিয়া অভ্যাস করিয়া লইত। এই ভাবে—বাঙলার গণসাহিত্য অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকা হইতে হাটুরিয়া কাঠুরিয়া,

মাঝি মাল্লা, রাখাল বাগাল পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। স্বাধীন বাঙলার খেয়াঘাটে, হাটে মাঠে কৃষক ও রাখালের মুখে যে গান গীত হইত, তাহা অশিক্ষিত মনের আনন্দোচ্ছ্বাস নহে, তাহা তখনকার শ্রেষ্ঠ ভাবুকদিগের শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদ!

গণ-সাহিত্য বলিলে তাহার প্রচার এবং প্রসারের কথাটাই আগের কথা হয়। স্বাধীন বঙ্গে প্রচার ও প্রসার দুইটাই ব্যাপক ভাবে হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ, প্রচারের সর্ব্বজনীন, সুলভ ও সুন্দর পদ্ধতি; দ্বিতীয় কারণ ভাবসম্পদের সার্ব্বভৌমিকতা এবং স্বভাবানুবর্ত্তিতা। প্রচারের কথা বলিয়া পরে ভাবের কথা আলোচনা করা যাইবে। বলিয়াছি—ভারতে শ্রুতিমূলক জ্ঞানসাধনা পদ্ধতি সনাতন প্রথা। সেই আদিম প্রণালীটাই যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হইয়া পাঠ ও কথকতার আকার ধারণ করে। কথকতাটি যাত্রাগানের মতই ব্যাপক ছিল। তবে কথকতার মধ্যে বারোয়ারীর ভাবটি খুব কম ছিল। কথকতা—অনেকটা ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়। তবুও একজন শাস্ত্র কথা ও হিতবাক্য শ্রবণ করিয়া আধ্যাত্মিক কল্যাণকামনায় কথকতা দিলে,

সেখানে গ্রামের দশজনও তাহা শুনিতে আসিত, এবং ইহার জন্য নিমন্ত্রণও করা হইত। এই কথকতাও গণসাহিত্য এবং গণসাহিত্য প্রচারক।

ইহার পরই বারোয়ারী; বারোয়ারী বাঙলার একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান! প্রতি পল্লীতে গণ্ডগ্রাম হইতে, প্রতি পাড়ায় প্রতি বছরে একবার করিয়া মহা সমারোহে বারোয়ারী হইত। এই বারোয়ারীতে যাত্রা ত হইতই, পরন্তু কীর্ত্তন কথকতা কবি পাঁচালীও হইত!

এই বারোয়ারীগুলি এখনকারদিনের সাহিত্য সম্মিলনের মত। এই সব বারোয়ারীতে নূতন রচিত যাত্রার পালা অভিনীত হইত—নূতন বিষয় কথকতা হইত—নূতন সাহিত্যিকের সাহিত্য-শক্তির পরিচয় দেওয়া হইত। ইহার ব্যাপকতা খুবই বেশী ছিল। তারপর এককালেই সব গ্রামে বারোয়ারী হইত না; এ মাসে এ গ্রামে, ও-মাসে অন্য গ্রামে এমনি করিয়া ক্রমপর্য্যায়ে চলিত। কাজেই এ গ্রামের উৎসবের সময় ও-গ্রামের লোকে শুনিত এবং ও-গ্রামের উৎসবের সময় এ-গ্রামের লোকে শুনিত; ফলে প্রত্যেকটি প্রত্যেকের মধ্যেই প্রচার হইয়া যাইত। একখানি

নাটক, একটি গান, একটি আদর্শ সকলের মধ্যে সমান-ভাবে প্রসার লাভ করিত।

তারপর ভিখারীরা যেমন গান গাহিয়া বেড়াইত, তেমনি আর একটি সম্প্রদায় ছিল—তাঁহাদের কাজও সঙ্গীত—তাঁহারা কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়। এই কীর্ত্তন-গান গাওয়া ছিল—ইঁহাদের জীবিকা। কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় প্রাচীন এবং সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যধারাকে সঙ্গীত মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন। এই কীর্ত্তন ছিল—উন্নততর কাব্যকলার প্রচারক। সাহিত্যের যে অংশটী শুধু আবেগ উচ্ছ্বাস নহে, কেবল ভক্তি প্রীতি ও উন্নততর ভাবুকতা নহে, পরন্তু এই সবই কারুকলার সাহায্যে অভিব্যক্ত—কীর্ত্তনের তাহাই উপজীব্য। তাই বলিয়া, ইহা যে কেবল শিক্ষিত মনের আহার্য্য তাহা নহে, ইহা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই সমানভাবে অভিভূত করিত। কীর্ত্তনীয়াদের গাহিবার পদ্ধতিটি অনেকটা ব্যাখ্যা-প্রণালীর মত ; তাঁহারা আকারে ইঙ্গিতে, নানা উপমা উদাহরণ, নানা সহজ দৃষ্টান্ত সহায়ে নিত্য পরিচিত নানা আঁখর দিয়া সুগভীর কাব্যরসকে সহজ সরল করিয়া তুলিতেন। এমনি করিয়া সাহিত্যের মহৎভাব

ও কারুকলা (art) জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে।

বাঙলার সমাজ গঠন প্রণালী এমনি বহুভাবে সাহিত্য প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া জাতি-জীবনকে জ্ঞানদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রচারের পর এইবার ভাবের কথা—আদর্শের ইতিবৃত্ত, চিন্তার বিশিষ্টতার পরিচয়।

স্বাধীন বাঙলার সাহিত্য—প্রধানতঃ তিনটী ধারায় প্রবাহিত হইলেও উহার কতকগুলি শাখাও ছিল এবং এই সব গুলিরই স্বতন্ত্র আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল। সর্ব্বপ্রথমে সঙ্গীত; কারণ গানই তদানীন্তন সমাজে বহুল প্রচারিত ছিল। এই সঙ্গীত-সাহিত্য স্বাধীন বাঙলার ধর্ম্ম-সাহিত্য বা দার্শনিক-সাহিত্য বিশেষ। বাঙলার চিন্তাবীরগণ বুঝিতেন, যে মানুষের মনটা সহজ পতনশীল, তাহাকে দৃঢ় করিয়া ধরিতে হয়, মৃত্তিকার ধূলিমালিন্য হইতে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিতে হয়, তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যুযুৎসু সৈনিকের মত সাবধান ও সতর্ক রহিতে হয়, নহিলে পতন অনিবার্য্য। এই জন্যই তাঁহারা সাহিত্যের পাঞ্চজন্য বাজাইয়া পতনপন্থী মানবকে উদ্বুদ্ধ করিতেন—মানুষকে মনে করাইয়া

দিতেন যে, সে পশু নয়, বাসনার দাস নয়—সে বদ্ধ নয়।

সাহিত্যে ভাষার কারুতা,—রচনার চাতুর্য্য, ভাবের লঘুত্ব,ও শ্রেয়ত্ব—এই সব ভাল লাগে বটে,কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ সময়ে মানবের অন্তরে যে দেবতাটি আছেন, তিনি ক্রমশঃ অসুর হইয়া উঠেন, নরচরিত্রে যে শক্তিটি অক্ষুন্ন রহিয়া তাহাকে মনুষ্যত্ব-সাধনায় সামর্থ্য দান করে, তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। মানব মনটিকে সজাগ্রত ও শক্তিমান রাখিতে সাহিত্যে ওজস্বিনী বাণী ঘোষিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ সাধারণ মানুষ—যাহাদের মানবতার ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়, তাহাদের জন্য সাহিত্যকলা ( art ) অপেক্ষা মনুষ্যত্ব পরিপোষক ভাব, চিন্তা ও আদর্শই সমধিক প্রয়োজনীয়।

সাধক যেমন ইষ্টদেবতাকে অহরহ অন্তরের মাঝে জাগ্রত করিয়া রাখেন এবং অচ্যুত ধ্যান-ধৃতির জন্য সাধনা করেন, সাধারণের সত্যনিষ্ঠার ও সত্যধৃতির জন্য একটা কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন তেমনই রহিয়াছে। আর সাহিত্যই এই সত্য স্মরণের একমাত্র শরণি। বাঙলার সঙ্গীত-সাহিত্যের ধারা এই জন্যই অধ্যাত্ম-পন্থী ছিল; জাতিসাধারণকে তাহার মানব-

ব্রত স্মরণ করাইয়া দিত, কর্ত্তব্যবিমুখকে কর্ত্তব্য প্রণোদিত করাইত। সেই জন্যই কর্ম্মক্লান্ত শ্রমিকের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিত—

"মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না ॥"

এই সব গানেরও তুইটা স্তর আছে; একটি শুদ্ধ দার্শনিকতা; তাহাতে মস্তিষ্কে চিন্তার লহরী তুলিয়া দেয়, বিমুখী মনকে ভাবাইয়া তোলে, জড়মলিন চিত্তের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার আলোক জ্বালাইয়া দেয়; এ সাহিত্যের মুখ্য কথা—

"এমন মানব জমিন্ রইলো পড়ে
আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোনা ॥"

এই সঙ্গীত সাহিত্যের অন্য দিকটা ঈশ্বর নিষ্ঠার দিক। শুধু নীতি, কেবলমাত্র উপদেশ ভিত্তিহীন; নীতির সহিত ঐশ্বরিকতার আবশ্যক, নহিলে নৈতিকতার কোন মূল্যই থাকে না। বাঙলার গণ-সাহিত্যের ভিতর ঐশ্বরিকতার ভাবটিই বিশেষ প্রবল। এই ঐশ্বরিকতারও একটা বিশিষ্টতা রহিয়াছে।

স্বাধীন বাঙালীর ধ্যানে যে ঈশ্বর প্রকট হইয়াছিলেন—তিনি তত্ত্বের ও জ্ঞানের ঈশ্বর নহেন, তিনি

অচিন্ত্য অব্যক্ত কিছু নহেন। বাঙালীর ঈশ্বর—রসস্বরূপ—উপনিষদের "রস বৈ সঃ।" এ রস মানবতার রস,—যে রস মানুষের হৃদয়ে সহস্র ধারায় বহিয়া যাইতেছে—যে রসকে মানুষ সহজে গ্রহণ করিতে পারে, যাহা মানুষের কাছে মূর্ত্ত সত্য, যাহার জন্য সে নিজেকে উৎসর্গ করিতে পারে, বলিদান করিতে আনন্দ বোধ করে—ইহা সেই রস; অর্থাৎ স্নেহ, বাৎসল্য, ভক্তি, ভালবাসার রস। বাঙালী ভগবানকে পুত্ররূপে, সখারূপে, জননীরূপে পাইতে চাহিয়াছে; তাই তাহার আধ্যাত্মিক সাহিত্যে পণ্ডিতের তাত্ত্বিকতা না হইয়া অপূর্ব্ব রস সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাহিত্য ত মানব মনের ভাবসম্পদের সাকার বিগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নহে। মনুষ্যের পরিচিত এবং প্রিয়তম ভাব ও চিন্তার মধ্যে এই স্নেহ, প্রীতি, বাৎসল্য, মৈত্রী ব্যতীত আর কি রহিতে পারে? মানব চিন্তার বহুলতা ও বিচিত্রতা এ সবেরই রূপান্তর মাত্র। বাঙালীর কবিচিত্ত এই চিরপরিচিত রস বোধের একান্ত সত্য অনুভবের মধ্যে ভগবানকে পাইতে চাহিয়া ও লাভ করিয়া অনুরাগের প্রেরণায় এবং সিদ্ধির উল্লাসে যে আবেগ, উচ্ছ্বাস, ভক্তি, ভালবাসা প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা সাহিত্যের ও সত্যের অপূর্ব্ব সম্পদ।

দ্বিতীয় কথা—এই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে ঈশ্বর ও মানুষে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া রস সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছে, ইহার কারণ ঈশ্বরই রস-স্বরূপ। বাঙালী সিদ্ধান্ত করিয়াছিল—"স্বরূপ নহিলে রূপের জনম" সম্ভব হয় না। যা হয়, তাহা রস নহে—কু রস। তাই বাঙালী রস-স্বরূপকে চিনিয়া রস সৃষ্টির ও রসভোগের বাসনা করিয়াছিল। আর সেইজন্যই সেকালের বঙ্গসাহিত্যে এমন আধ্যাত্মিকতার আধিক্য, ঈশ্বর কথার এত বাহুল্য। রসরসিক বাঙালী রস-স্বরূপকে পাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাহার সাহিত্য-শিল্পে অপূর্ব্ব রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছিল, তাই সে গাহিয়াছিল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"

এ রূপ আলেয়ার দীপ্তি নহে, চকিতের চাকচিক্য নহে—এ রূপ শাশ্বত মঙ্গল-মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত, এ রূপের প্রেমিক বলিতে পারে—

"সুধা ছানিয়া কেবা ও-রূপ গড়িল গো!"

এই সুধা-বিনিন্দিত রূপ দেখিয়া বঙ্গকাব্যে সুধার

স্রোত বহিয়াছিল—ইহার প্রমাণ বৈষ্ণব এবং শাক্ত গীতিকাব্য।

আর একটি কথা, শুধু মানুষকে কেন্দ্র করিয়া যাহার উৎপত্তি এবং পরিপুষ্টি, তাহা মনুষ্য স্বভাবে যে পাশবতা আছে, তাহা দ্বারা আক্রান্ত ও আচ্ছন্ন হইয়া চিত্তকে কলুষিত করিয়া তোলে। তাই স্বাধীন বাঙালী সাহিত্যে মানুষের সংস্পর্শের আধিক্য না রাখিয়া উহাকে ভাগবতস্পর্শে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। সেইজন্য বাঙলার গীতিকাব্যে ইহাই বেশী করিয়া শুনিতে পাওয়া যায়—

"দিন গেল মিছা কাজে, রাত্রি গেল নিদ্রে,
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে॥"

ঈশ্বরই যদি মানব জীবনের পরম সাধ্য হন, তবে চিত্তকে ঈশ্বরমুখী করিতে, সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বচিন্তাকেও ঈশ্বরপরায়ণ করিতে হয়। রসকেও করিতে হয়, রূপকেও করিতে হয়।

বিগতকালের বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় ধারা হইতেছে—নাটক এবং গীতিনাট্য। নাটক স্বাধীনযুগের লোকায়ত সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এই নাটকই তখনকার দিনের বস্তু-তান্ত্রিক সাহিত্য।

নাটকের প্রধান কাজ অভিনয়ের সাহায্যে চিত্ত বিনোদন। অনেক সময় নাটক কেবল চিত্ত বিনোদকই হইয়া থাকে ; কিন্তু স্বাধীন বাঙলার নাট্য-সাহিত্য এমন একদেশ ছিল না ; উহা এক সঙ্গে—আনন্দজনক ও শিক্ষণীয় ছিল। নাচিলে গাহিলে আমোদ হয়, স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা শিক্ষণীয় না হইতেও পারে। আর শিক্ষণীয় না হইলে তাহাতে নর-জাতীর অশেষ অকল্যাণ হয়। তাই স্বাধীন বাঙলার নাট্য-সাহিত্য চরিত্রোৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন ছিল।

চরিত্রোৎকর্ষ অর্থ—মানবতার শিক্ষা, মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণ জীবন দিয়া গ্রহণ করিয়া, জীবন দিয়া ফলাইয়া তোলা। বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার মধ্যে সব সময়ে মনুষ্যত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি ফুটিয়া উঠে না। তাই অতীতকে অনুসরণ করিতে হয় ; অতীতের রঙ্গ-মঞ্চে যে মহীয়ান চরিত্রগুলি আত্মবিকাশ করিয়া পরবর্ত্তী সর্ব্বকালের মানবগোষ্ঠীর জীবন-পথের সম্বল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান, সেই গুলিকে নাট্যকৌশলে বর্ত্তমানের চক্ষের কাছে ফুটাইয়া তুলিলে, বর্ত্তমান মানব-সমাজ একটি সমুন্নত আদর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইবার সুযোগ পায়।

এই আদর্শ চরিত্রগুলি রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে নিহিত আছে। তাই এই সব নাটক পৌরাণিক নাটক। পুরাণে যে চরিত্রগুলি আছে, তাহাতে বুদ্ধির উপভোগ্য অপেক্ষা চরিত্র প্রসারক ভাবের প্রেরণাই সমধিক। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতিতে যে রস আছে, তাহা ভক্তি. প্রীতি, করুণ, বীর প্রভৃতি রস অর্থাৎ যে রসে মানুষকে পশুত্ব হইতে উন্নীত করে—সেই রস।

পুরাণের আদর্শ লইয়া স্বাধীন বাঙলার নাট্য-সাহিত্য বিরচিত হইত; উহাতে সেই পৌরাণিক আদর্শই অনুসৃত হইত। ভারতের যাহা সনাতন আদর্শ বাঙলার গণ-সাহিত্য তাহাতেই বিরচিত হইত। এই জন্য বাঙলার মুটে মজুর, হাটুরিয়া কাঠুরিয়া অবধি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষণের ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার পাতিব্রত্য, হরিশ্চন্দ্র শিবির সত্যব্রত প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইত। বাঙলার গণ-সাহিত্য মানুষকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া দেখে নাই, তাই তাহাকে সংসারেরই উপযুক্ত করিতে চাহিয়া, এই সব বাস্তব চরিতচিত্র আঁকিয়াছে, —যাহা পুণ্যের, ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃশ্য। এই নাট্য-সাহিত্য মানব-ধর্ম্মের মন্ত্র বিশেষ।

এ সাহিত্যে মনোবিজ্ঞানমূলক বৈচিত্র্য ছিল না, কিন্তু রস ছিল। অন্ততঃ সাহিত্যাচার্য্যগণ এই সব চরিতচিত্রের মধ্যে রসের প্রবাহ বহাইতেন, যাহাতে জনচিত্তকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। বাঙলার বারোয়ারীতলায় যখন অভিনয় হইত, তখন চক্ষে চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহিয়া যাইত, বক্ষে বক্ষে ভাবের তরঙ্গ উঠিত; সাহিত্য যে সহিত অর্থ বোধক, তাহা সার্থক হইয়া উঠিত।

সাহিত্যে বাস্তব এবং কল্পনা উভয়ই থাকে। বিশেষতঃ বস্তুতান্ত্রিক কাব্য ও নাটকে একটি না একটির আশ্রয় লইতে হয়। কল্পনা চিরদিনই কল্পনা, তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই। কথা হইতেছে বাস্তবের। সাহিত্যের বাস্তবতা কখনও পুরাণকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, কখন ইতিহাসকেও অবলম্বন করে। এই ইতিহাসও পুরাণের কাছাকাছি। কাব্য নাটকের আর একটি বিশিষ্ট উপাদান আছে, তাহা বর্ত্তমানের বাস্তবতা। বর্ত্তমান সমাজের যে চরিত্রগুলি তাহার শক্তি, সামর্থ্য, পুণ্য, পবিত্রতা, তাহার ত্যাগ, প্রীতি লইয়া নিতান্ত সাধারণভাবে অথচ পুরাণ ইতিহাসের অবদান পরম্পরার মতই মহিমা ও গরিমাময় কর্ত্তব্য সম্পাদন

করিয়া যায়; তাহার কাহিনীগুলি কহিয়া যাওয়াও সাহিত্যের একটি প্রধানতম দায়িত্ব। পুরাণ ইতিহাস যত উন্নতই হউক, তাহা যেন আপনার হইতে পারে না; কিন্তু বর্ত্তমান আত্মীয়ের মত অন্তরঙ্গ, প্রিয়ের মত প্রিয়তম, বর্ত্তমানের বাস্তবতায় চিত্তকে অধিকতর আকৃষ্ট করে। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যত ইতিহাস লেখকের হাতে যাহা অনেকটা সত্য হইত, তাহা বর্ত্তমানের কথনে অধিতর সত্যযুত হয়।

পুরাণ ইতিহাস গণতান্ত্রিক হয় না—অন্ততঃ হয় নাই। উহা প্রায়ই অভিজাতশ্রেণীর অবদান-পরম্পরা। অবশ্য রামায়ণ মহাভারতের কথা স্বতন্ত্র। তত্রাচ এই শ্রেণীর আদর্শ ও ভাব পরিপূর্ণভাবে জাতীয় চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। এই সব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক মহত্ত্বকে সাধারণে শ্রদ্ধা করে, অনুসরণ করিতেও চেষ্টা করে, তবু যেন একটা ফাঁক থাকিয়া যায়। সাধারণে ভাবে—ঐ সব শূরত্ব, বীরত্ব, ত্যাগ মহত্ত্ব,—উহা স্বর্গীয়, উহা নরলোকের পূজা করিবার।

কিন্তু মানুষ যদি দেখে তাহাদের মধ্যেই মহিমার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে, তাহাদের নগণ্য জীবনযাত্রার

মধ্যেই মহিমা আছে, বীরত্ব আছে, দেবতার মত দৈবী-ভাব আছে, তবে জনসাধারণের মধ্যেও আত্ম-শক্তির উন্মেষ হয়। এইজন্যই সাহিত্যের একটি অংশকে জনসাধারণের জীবনকথায় ভরাইয়া তুলিতে হয়। আর ইহাই সত্যকার গণ-সাহিত্য।

বর্ত্তমানের জাতি-জীবনের কথা লইয়া যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা কেবলই সাহিত্য নয়—তাহা সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস। দুই পাঁচশত বৎসর পরে শিলালিপি, তাম্রলেখ পাঠ করিয়া ও অনুসন্ধান (research) করিয়া যে ইতিহাস, তাহা অপেক্ষা এই সাহিত্য-প্রকীর্ত্তিত ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস।

স্বাধীন বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণ একটি মাধুর্য্য-স্নিগ্ধ, পুণ্যপ্লুত, শৌর্য্য-দীপ্ত গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে সাহিত্যে অতীত কালের অথবা স্বর্গলোকের দেবতা-ঋষি, সাধু-সন্ত, শূর-বীর প্রভৃতির কথা নাই, তাহাতে আছে—বাঙলার ব্যাধের মহত্ত্বের কথা—শ্রমিকের শৌর্য্যকাহিনী, মানবী গৃহস্থকন্যার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্যের কথা; এক কথায় ইতিহাসে যাহারা উপেক্ষিত, স্বাধীন বাঙলার গণতান্ত্রিক সাহিত্য তাহাদের জীবন-কাহিনী লইয়াই বিরচিত।

আজকাল এই রকম একটা প্রচেষ্টা চলিতেছে,—কুলি ও মজুরের অখ্যাত অবজ্ঞাত জীবন লইয়া একটা সাহিত্য গঠিত হইতেছে। ইহা অধিকাংশ সময়েই অধঃপতিতের ইতিহাস। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য যাহাদের কথা কহিয়াছে,—তাহারা সামাজিক বিচারে ছোট, কর্ম্মে কিন্তু অভিজাতের গুরু ও আদর্শ হইবার যোগ্য। বাঙলার নৃপতি সিদ্ধাই হাড়ির কাছে মন্ত্রদীক্ষিত। বাঙালী সাহিত্যিকের কাছে মুটে মজুর, ডোম ডোক্‌লা, হাড়ী বাগ্দী অবমানিত, অবনমিত ও উপেক্ষিত নহেন, পরন্তু তাহারা সমুন্নত ও শুদ্ধচরিত্র।

এই গণ-তান্ত্রিক সাহিত্য জনসাধারণ যেমন এক-দিকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, অপর দিকে ইহাতে আত্মশক্তিরও বিকাশ ঘটিয়াছিল; জাতি একটি আদর্শ পাইয়াছিল এবং সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আজও যে বাঙলার শ্রমজীবী শিষ্ট, সংযত, ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ, আজও যে শ্রমিক-বধূ উচ্চশিক্ষিতা নারীর মত সুশীলা ও পতিব্রতা, তাহার কারণ ঐ গণ-সাহিত্যের প্রভাব। বাঙলার প্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত সমগ্র

নারীসমাজ সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রভৃতির কাহিনী শুনিয়াছেন এবং তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

এই গণ-সাহিত্যের আর একটি রূপ—কাহিনী অর্থাৎ গল্প, রূপকথা, ছড়া প্রভৃতি। ইহার ভিতর কতকটা শিশু-সাহিত্যও ছিল। এ সাহিত্যের স্রষ্টা পণ্ডিতসঙ্ঘ নহেন; কাহিনীর রচয়িতা যাহারা—তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর ছিল। এই কাহিনী-সাহিত্য তখনকার দিনের উপন্যাস ছিল। ইহাতে এমন কল্পনা-শক্তির পরিচয় আছে, যাহা উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসেরও উপাদান হইতে পারে। কাহিনীতে সাক্ষর নিরক্ষর, স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই সাহিত্যপ্রতিভা অনুশীলিত হইত। এবং বাঙালীর অবসর কালের একটি পরম আনন্দপ্রদ বস্তু হইয়া স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ সকলেরই চিত্ত বিনোদন করিত। এখনো যে ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার ঝুলিতে অপূর্ব্ব রহস্যময় গল্পগুলি মণিমুক্তার মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, উহা সেই গত কালের কাহিনী-সাহিত্য। ইহা ছাড়া ছিল ব্রতকথা,—উহা একেবারে নারী-সাহিত্য। ব্রতকথার মধ্যে নারীজাতির কর্ত্তব্য-পন্থারই বিশেষ ইঙ্গিত ছিল, উহা কিশোরী হইতে বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই ব্রত-নিয়মে শ্রবণ করিতেন।

স্বাধীন বাঙলার গণ-সাহিত্য মায়ের মত সমস্ত জাতিকে বক্ষে ধরিয়া তাহাকে যে রস পান করাইয়াছিল, তাহাতে জাতি একটি পরম দিব্য-জীবন লাভ করিয়াছিল। সে দিব্য-জীবনের পরিচয় বাঙলার জনসাধারণের ধর্ম্মপ্রাণতা, গৃহস্থের একান্নবর্ত্তীতা, কুললক্ষ্মীর পাতিব্রত্য এবং সমাজ-সংহতির অক্ষুন্ন শৃঙ্খলতা।

স্বাধীন বাঙলার গণ-সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে, বাঙলার বিগত দিনের সামাজিক জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে। সেই অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সে সাহিত্য অমৃতের মত মধুর ও সঞ্জীবন। আর সেই সাহিত্যই যথার্থ সাহিত্য, কারণ তাহা সাধারণের সহিত একান্তভাবে মিলিত হইয়াছিল।

# স্বাধীন বাঙলার জন-সমাজ

যাহাদের লইয়া স্বাধীন বাঙলা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলিলে স্বাধীন বাঙলার প্রধান কথাটাই বলা হয় না। যাহাদের শক্তি-সামর্থ্যে, চরিত্রমাহাত্ম্যে একটি স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য-পরিস্ফুট সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহারা কেমন ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। ইহার আর একটি প্রয়োজনীয়তা, এই জন-সমাজই স্বাধীন বঙ্গের বিশিষ্ট গৌরব। ইহাদের শূরত্ব, বীরত্ব, ত্যাগ, তপস্যা, ঐক্য ও মৈত্রী, নিষ্ঠা, সদাচার ঐ সুবৃহৎ সমাজকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল।

স্বাধীন বঙ্গের জনসমাজের বিশেষত্ব উহার গণ-তান্ত্রিকতা। এ সমাজে কেবল শ্রেষ্ঠই গরিষ্ঠ ছিল না; পরন্তু জনসাধারণ যাহাদের জীবন-যাপনের কোন বৈশিষ্ট্যই নাই, বর্ত্তমানের ব্যবহারে যাহারা সমাজের অন্তরালে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হয়, তাহাদের অবদান পরম্পরাই স্বাধীন বাঙলার মহিমান্বিত ঐতিহ্য।

বাঙলার অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান যেমন প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে, বাঙালীর সমাজে খুঁজিয়া পাওয়া

যায়, প্রাচীন জনসমাজের চিত্রও তেমনি উহার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। মাণিকচাঁদের গীত, মনসামঙ্গল, কঙ্কনচণ্ডী, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল বঙ্গ-ইতিহাসের এই সকল প্রামাণিক গ্রন্থ। আজকাল ইতিহাস লিখিতে হইলে, পাদটীকার প্রমাণ ও প্রামাণিক গ্রন্থের মন্তব্য দেওয়ার রীতি আছে। তাহা করিলাম না। কারণ স্বাধীন বাঙলার ইতিহাস বাঙালীর স্বাজাত্য-বোধের অনুপ্রেরণায় রচিত হইতেছে। যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমতাপরায়ণ, তাঁহারা ইহাকে একান্ত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন এবং প্রমাণ খুঁজিতে ইচ্ছা করিলে শ্রদ্ধাভরে ঐ গ্রন্থগুলি পড়িতে পারেন; এবং এখনও যে অবশিষ্ট প্রাচীন বাঙালীর সমাজ অবহেলায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

সমাজ সুবৃহৎ অট্টালিকার মত বহুজনের শক্তিতে গঠিত হয়। যাঁহারা গঠন করে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সম পরিমাণে উপযোগিতা আছে; কেহ ছোট, কেহ বড় নয়। তবে এই নির্ম্মাণ ব্যাপারে কাহাকেও বিশিষ্ট করিয়া তোলা হয়, কাহারও অবদানের কোন পরিচয়ই দেওয়া হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া যে সেই কাজগুলি

তুচ্ছ, তাহা নহে, বরং প্রয়োজনীয়তার পরিমাণে—সমাজের কল্যাণের বিচারে সেই সব গুলিই মূল্যবান।

স্বাধীন বাঙলায় যে মানুষগুলি সমাজের পুরোভাগে ছিল না, তাহাদের সেই বিশিষ্টতাবিহীন প্রচ্ছন্নতাই তাহাদের অন্যতম চরিত্রমাহাত্ম্য।

জাতি ও দেশের জন্য এই জনসমাজ যে ত্যাগ ও শক্তি নিবেদন করিয়াছে—তাহার জন্য একটা উচ্চঘোষিত প্রশংসা পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সবকে ইহারা উপেক্ষা করিয়া নীরবে যাবতীয় কর্ত্তব্যগুলি সমাধা করিয়া গিয়াছে।

তাহার পর, যে কাজ তাহারা করিয়াছে, তাহাও যে কোন দিনের গণনায় মূল্যবান, তাহাও নহে। কেন না, সে সব সেনাপতিত্বও নহে, সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাও নহে, অদ্ভুত পাণ্ডিত্যও নহে, বা ঐ প্রকারের কোন মহিমাব্যঞ্জক কর্ম্মও নহে; বরং উহা একান্তই সাধারণ।

কিন্তু বাঙলায় সাধারণ জীবনেই অসাধারণত্ব রহিয়াছে। যাহা ফুলিয়া ওঠে, ফাঁপিয়া ওঠে, তাহা অসাধারণ হইতে পারে, কিন্তু যাহা অসাধারণের সাধনা করিয়াও উচ্ছ্বসিত না হইয়া সংযত থাকে, তাহাকে মহনীয়

অসাধারণ বলা যায়। বাঙলার জন-সমাজ এই প্রকার সংযত অসাধারণ ছিল।

বাঙালীর সমাজ ভারতবর্ষীয় বর্ণাশ্রমী সমাজের একাংশ মাত্র। কাজেই বর্ণাশ্রমবিজ্ঞানই উহার মূল ভিত্তি।

বর্ণাশ্রমের রীতি অনুসারে বাঙলার সমাজে কর্ম্মের ও কর্ত্তব্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে। উহা কাহারও উল্লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। সামাজিক নিয়মানুসারে যাহার যে কর্ম্ম ও বৃত্তি নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তাহাকে সেই কর্ম্ম ও বৃত্তিতেই আমরণ সুসংযত রহিতে হইবে। এক শ্রেণীর লোককে এমন কাজ করিতে হয়, যাহার কোন মর্য্যাদা নাই, যাহা করিতে কোন উত্তেজনা আসে না, যাহার সাধনে কোন প্রশংসা নাই।

এই কাজগুলি নিতান্তই সাধারণ, তেমনই আবার ইহা সমাজস্থিতির পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। উহা না করিলে সমাজ অচল হইয়া পড়ে। ঐগুলি কঠিন—কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্ম্ম।

কিন্তু মানবপ্রকৃতি নিত্যই উত্তেজনা চাহে। যে কাজে আয়াস কম অথচ আয়েস বেশী, যাহা

করিয়া বাহবা বেশী পাওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ও বৃত্তির দিকে মানব স্বভাবের অত্যধিক আগ্রহ দেখা যায়।

এই স্থান হইতে মনুষ্যকে বিচার করা যাইতে পারে। সম্মানের মাদকতায় মানুষ অনেক কিছু করিতে পারে; কিন্তু নীরবে প্রশংসাহীন কর্ম্ম—চরিত্র-বলের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভর করে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ধর্ম্মবোধ, সমাজের মঙ্গলের প্রতি একান্ত মমতা না রহিলে সমাজসেবার এই অবশ্যকরণীয় কাজগুলি শ্রদ্ধালু আনুরক্তির সহিত সম্পন্ন করা যায় না।

স্বাধীন বাঙলায় যে জনসঙ্ঘের পরিচয় লইতে হইবে, তাহারা এই নীরব, ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ম্মী। তাহারা সমাজের ভিত্তি স্বরূপ। তাহারা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জাতি-জীবনে জীবনীশক্তির মত প্রবাহিত হইয়া উহাকে সুস্থ, স্বস্থ ও শোভিত করিয়াছে। সহজেই যাহারা উপদ্রবের সৃষ্টি করিতে পারিত, তাহারা শান্তভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া চলিয়াছে, যাহারা লজ্জার কারণ হইতে পারিত, তাহারা গৌরব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলার জনশক্তিকে চিনিতে হইলে সমাজের উন্নত পর্য্যায় হইতে একবারে নিম্নস্তরে নামিয়া আসিতে হইবে।

সমাজের ব্যক্তিগুলি যেমন উহার অবলম্বন—তেমনি উহার বিঘ্নও হইতে পারে। জগতের অনেক সমাজে বিভ্রাটের ইতিহাস আছে। প্রত্যেকের জিগীষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বৈষম্যের ফলে কত সমাজ অন্তর্বিগ্রহে ধ্বংস হইয়াছে ও হইতেছে। বাঙলার জনগণ কখনও কিন্তু তাহার সমাজের বিঘ্ন হয় নাই।

সমাজ একটি বিপুল ব্যাপার। "জুতা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ" পর্য্যন্ত তাহার অঙ্গীভূত। সমাজে ছোট কাজও আছে, বড় কাজও আছে। তত্ত্ববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অবশ্য ছোট বড় নাই; যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই মর্য্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু ব্যবহারিক বিচারে একটা ভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকে ভাবে কোন কাজ ছোট, কোন কাজ বড়। সুদৃশ্য পরিচ্ছদ শোভিত হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা যেমন সম্মানজনক, কাঠ কাটা তেমনি গৌরবের ত নহেই, পরন্তু তাহা সামান্য ও হীনতাব্যঞ্জক; এবং এইসব তথাকথিত সামান্য ও ছোট কাজ যত আয়াসসাধ্য, বড় কাজগুলি তেমন নহে। বড় কাজের অধিকাংশই ছোটরা করিয়া দেয়, বড় শুধু নেতৃত্ব করিয়া গৌরবটুকু ভোগ করে। শুধু গৌরব নহে, উহাতে আয়েসও অধিক। এমন-

ক্ষেত্রে বড় কাজের প্রতি আনুরক্তি একান্তই স্বাভাবিক। এই ভাবটিই রূপান্তরিত হইয়া "জীবন-সংগ্রাম" এই বৈজ্ঞানিক নাম পাইয়াছে; এবং ইহার জন্যই আজ জগদ্ব্যাপী অশান্তির ঝঞ্ঝা বহিতেছে ও নানা সামাজিক সমস্যা উত্থিত হইয়া সমাজপতিগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

বিজ্ঞান ও প্রকৃতি এক বস্তু নহে। যুক্তি—বিজ্ঞানের অবলম্বন, প্রকৃতি—জীবনের অঙ্গীভূত। বাঙলার জনসমাজ বিজ্ঞানের যুক্তিবশে তাহার সমাজের অনুগত হয় নাই, তাহাদের স্বভাবই সংযত ও নীতি-নিষ্ঠ ছিল। তাহাদের বাহুতে শক্তি ছিল, কিন্তু সে শক্তির অপব্যবহার করে নাই। তাই বলিয়া তাহারা যে মেষের মত নিরীহ ছিল, বা দাসের মত বুদ্ধিশূন্য ছিল, তাহাও নহে। বাঙলার শিল্প-কলায় ও কাব্য-সাহিত্যে যেমন বুদ্ধির পরিচয় দেদীপ্যমান, তেমনি নিরুপদ্রুত সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও বলবীর্য্যের পরিচয় রহিয়াছে। বলহীন সমাজের শান্তি থাকা অসম্ভব।

বলিয়াছি যে, ছোট বড় বলিয়া কাজের একটা প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মাটি কাটার যতটুকু সম্মান, কাপড় বোনার গৌরব তাহা অপেক্ষা বেশী। এইরূপে

নানা শ্রেণীর নানা কাজের বেশ ইতর বিশেষ আছে। কিন্তু ইহার জন্য যদি তথাকথিত ছোট কাজগুলি কেহ করিতে না চায়, তবে সামাজিক ব্যাপার অচল হইয়া যায়। স্বাধীন বাঙলার জনসমাজ এই তুচ্ছ প্রলোভনশূন্য কাজগুলি হাস্যমুখে সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে। ইহার বিজ্ঞাপিত পরিচয় নাই, অথচ সারা বাঙলার সর্ব্বস্ব জুড়িয়া তাহাদের কর্ম্মঠ হস্তের, উর্ব্বর মস্তিষ্কের, পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় আছে। এ পরিচয় সাহিত্যে, শিল্পে, মন্দিরে, দেউলে, দীঘি-সরোবরে, গীতে, গাথায় মূক মৌন ভাবে রহিয়াছে। বাঙলার সমুন্নত মন্দিরচূড়ায়, অব্যভিচারী ধর্ম্মজীবনে —বাঙালীর বীর্য্যের দীপ্তি উদ্ভাসিত।

বাঙলার স্বভাবধর্ম্ম বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে। কাজকে উহা সাধন করিয়া চলিয়াছে, ঘোষণাকে অবজ্ঞাই করিয়াছে। সেইজন্য তাহার কীর্ত্তিই পরিস্ফুট, কীর্ত্তন প্রচ্ছন্ন। গ্রীক্-সেনাবাহিনী লইয়া আলেকজাণ্ডার বাঙলার সীমান্তদেশে উপস্থিত হইলেন, উদ্দেশ্য বঙ্গ-বিজয়; কিন্তু দিগ্বিজয়ী সেকেন্দরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। অজয় নদের পরপারে—দুর্জ্জয় বাঙালী সৈনিকের বীর্য্যপ্লাবনে ভাসিয়া গেল—অর্দ্ধ-এশিয়াজয়ী দুর্দ্ধর্ষ

গ্রীক-সেনা। কাহাদের বাহুবল, কে সেনাপতি ইহার কোন ঘোষণা নাই। রাজপুত বা মারাঠা, অন্য কোন যুদ্ধকুশল ভারতীয় জাতি এ যুদ্ধ জয় করে নাই; করিয়াছে এই বাঙলার জনগণ;—যাহারা শান্তির দিনে পরম স্বস্তিতে গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে, যাহারা কৃষাণ, যাহারা শিল্পী, যাহারা শ্রমজীবী, তাহারাই এই গ্রীকবিজয়ী জাতি! তাহারা এই বাঙলার— হাড়ি, ডোম, দুলে, বাগ্দী, কেওট, কৈবর্ত্ত, চাষা, গোয়ালা,—এই বাঙলার—জনগণ,—অতি সাধারণ জনসমাজ।

বাঙলার জন-শক্তির কয়েকটি বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে চাই। এই জনগণ তাহাদের পর্ণকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া "মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে" এই বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক গান গাহিতে গাহিতে, যখনই দেশ, সমাজ, স্বধর্ম্ম ও স্বজাতি রক্ষার আহ্বান পাইয়াছে, অমনি বজ্রের মত জ্বলিয়া বিঘ্নকে ভস্মীভূত করিতে ছুটিয়াছে, নীরবে বুকের রক্ত ঢালিয়াছে; উৎপাত শেষ করিয়া আবার প্রশান্তভাবে গৃহাভিমুখী হইয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে, তাঁত বুনিয়াছে, মাটি কাটিয়াছে, শিষ্ট গৃহস্থের মত পুত্র কন্যা প্রতিপালনে মন দিয়াছে, আবার বৈরাগ্য-

মূলক গানে সান্ধ্য আকাশকে পবিত্র করিয়া দিয়াছে। এত বড় যে একটা বিজয়গর্ব্ব, তাহা তাহাদের চিত্তকে এতটুকু দর্পিত করে নাই। বক্ষ-রক্ত-ক্ষরণ,—মৃত্যু, ইহা তাহারা অতি সহজ কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিয়াছে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম, বিগত দিনের বাঙালীর জীবনে এমনি কত শত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। কতকাংশের পরিচয় এখনও কিছু পাওয়া যায়, কত কালকবলে কবলিত।

এই একটি ঘটনায় দেখিলাম, বাঙলার জনগণের চরিত্র কেমন ছিল।

সমাজ কোন সর্ত্ত নহে, পরন্তু উহার স্থিতি ও পরিপুষ্টি নির্ভর করে সমাজভুক্ত মনুষ্যগুলির প্রীতিও মৈত্রী প্রীতিতে। এই প্রীতির দুইটি প্রধান অন্তরায়—অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য এবং আভিজাত্য। বর্ত্তমান জগতের ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ দেশে যে ভীষণ সমাজবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, ইহার প্রধানতম কারণ আর্থিক পার্থক্য ও আভিজাত্য।

বাঙলায় অর্থনীতিক প্রভেদ এবং আভিজাত্য বিশেষভাবেই ছিল। কিন্তু উহা আধুনিক পাশ্চাত্য

পার্থক্য ও অবস্থার মত ছিল না; তাই বাঙলার জনগণ ও ঐশ্বর্য্যবান অভিজাতে কখনও বিরোধ বাধে নাই। বরং পরস্পর একান্ত হৃদ্যভাবে, এক পরিবার-ভুক্তের মত স্নেহ, মমতা, সৌহার্দ্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, স্বাধীন বাঙলার জনসাধারণ একান্ত স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিয়াছে।

অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যে শুধু যে বিরোধ বাধায় তাহা নহে, দারিদ্র্যের পেষণে মনুষ্য মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হয়। মানুষ কেনা গোলাম হয়; তাহার চরিত্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি স্তব্ধ হইয়া যায়। তাহার গার্হস্থ্য-জীবনে প্রবৃত্তি থাকে না, ধর্ম্মভাব থাকে না, সামাজিক মানুষের যে যে গুণ ও বৃত্তি থাকা উচিত, তাহা একে একে লোপ পাইয়া যায়। বর্ত্তমানের সভ্যতায় "কুলি" বলিয়া যে জীবশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, উহাই আর্থিক তারতম্যের অন্যতম কুফল।

স্বাধীন বাঙলার ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠায় এমন বিকৃত জীবের পরিচয় নাই। ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ— "কুলি" গার্হস্থ্য জীবনকে অঙ্গীকার করিতে চাহে না। বিগত দিনের বাঙলায় যদি "কুলি" শ্রেণীর

মত কোন শ্রেণী থাকিত, তবে আজও তাহাদের অস্তিত্ব—দুষ্ট ক্ষতের মত সমাজের এক অংশকে পীড়িত করিয়া রাখিত।

কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে এবং বর্ত্তমানের সমাজেও দেখা যায় যে, বাঙালীর প্রত্যেক জাতিটি, তাহার কর্ম্ম ও বৃত্তি যত সামান্যই হউক—যাহাদের অন্ত্যজ বলা হয়, তাহারাও প্রত্যেকে এক একটি গৃহস্থ,—সুসংযত, সামাজিক এবং ধর্ম্মনৈতিক বিধি বিধানে অভ্যস্ত, নিয়মনিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, সম্পূর্ণ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মানুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছে। বাঙালীর অতি প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যেও ইহার পরিচয় দেদীপ্যমান।

বাঙলার জনগণ যে স্বাধীন স্বতন্ত্র ছিল, তাহার অন্য পরিচয়ও আছে। আছে—কাব্য, গাথায়, গীতিতে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে। স্বাধীন বাঙলার অনেক কাব্য, অনেক সাহিত্য, অনেক গাথা ও গীতি এই জন-সাধারণের রচিত। কবি, পাঁচালি, তর্জ্জা ও নাটক শ্রেণীর বহু সাহিত্য, বাঙলার অতি সাধারণ জনগণের সৃষ্টি। ইহারা একেবারে নিরক্ষর। বর্ত্তমানে এই সব নিরক্ষর সাহিত্যিকের রচনা বঙ্গসাহিত্যে সংগৃহীত হইতেছে।

কেবল সাহিত্যে নয়, বাঙলার শ্রেষ্ঠ চারুকলা,

শ্রেষ্ঠ কারুকর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্য, জগদ্বিদিত বস্ত্রশিল্প, যন্ত্রশিল্প, এককথায় মানবসভ্যতার উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি জনগণের রচনা, তাহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত ও হস্তনির্ম্মিত। দাসভাবাপন্ন মানুষের এই প্রতিভা ও সৃষ্টিসামর্থ্য রহে না। ইউরোপের "কুলি" কলের সহিত কলের মত শুধু খাটিয়া যায়, জানে না কিসে কি হয়। তথায় এ সব শিক্ষিত জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের আবিষ্কৃত।

স্বাধীন বাঙলার জনগণের একটা বড় কীর্ত্তি তাহাদের সমাজ আনুগত্য। এই জনসমাজের শক্তি, সামর্থ্য, সৃষ্টিকৌশল ও মনীষা—মানবতার যাবতীয় বৃত্তি ও গুণ অভিজাত সম্প্রদায়ের মতই সমপরিমাণে ছিল, কিন্তু তাহারা কখন সমাজকে উল্লঙ্ঘন করে নাই, উচ্ছৃঙ্খল হয় নাই—সমাজবিধির আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিয়াছে। ধর্ম্মঘট, "ষ্ট্রাইক" এসব—সমাজদ্রোহী এবং অভিজাত-বিদ্বেষী বুদ্ধিতে বাঙলার জনসাধারণ কখনও আক্রান্ত হয় নাই। আত্মশক্তির পরিচয় জানিয়াও যাহারা এইভাবে সমাজানুগত্য করিয়াছে, তাহারা কত সুসভ্য, কত চরিত্রবান, তাহা সহজেই অনুমেয়। আরও প্রশংসার কথা যে, এই

স্বাকৃতি সমাজবিজ্ঞানের যুক্তিবশে, বা চুক্তিবশে হয় নাই, হইয়াছে প্রীতির বশে ;—অন্তরমাধুর্য্যে, ধর্ম্ম-ভাবের ফলে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায়।

স্বাধীন বাঙলার গণ-চরিত্রের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য, অন্ততঃ নিজেকে ততখানি সামর্থ্যবান মনে করি না। তবে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যবহারিক দিকটির পরিচয় দিতে হইবে এবং বর্ত্তমান সভ্যতা-গর্ব্বিত জগতের কাছে তাহা দেওয়া উচিত। উচিত এইজন্য যে, আমরা পাশ্চাত্যভাবে বিমুগ্ধ হইয়া সনাতন সমাজবিন্যাসকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত ; কিন্তু যদি এই দুর্দ্দিনে আমাদের নিজস্ব সমাজের স্বরূপটি দেখিতে পাই, হয়তো আমাদের বিভ্রান্ত মন স্বস্থ হইতে পারে। সেই ভরসায়, স্বাধীন বাঙলার কথা কহিলাম।

# বাঙালীর স্বাধীনতা বোধ

বাঙালীর স্বাধীনতার একটু বৈশিষ্ট্য আছে ;—উহা রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের মুখাপেক্ষী নহে। যে কেহ বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করুক, যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বাঙলার রাষ্ট্রাধীপ হউক, তাহাতে হিন্দু বাঙালীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্ত্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইত না। ইহা প্রাক্-বৃটীশ যুগের বাঙলার ও বাঙালীর কথা।

অপর জাতির বা ধর্ম্মাবলম্বীর স্বাধীনতা রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বী রাজা হইলে স্বাধীনতা বজায় থাকে, নহিলে রহে না। বাঙলায় যে কেহ রাজা হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। মুসলমান শাসনকাল পর্য্যন্ত বাঙালীর এই অবস্থাই ছিল।

বাঙালীর স্বাধীনতার নাম অন্তঃশাসন—আপনা আপনি শাসিত হওয়া—আত্মকর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হওয়া। এইখানে স্বাধীনতার একটু পরিচয় লওয়া আবশ্যক। স্বাধীনতার স্বরূপই হইতেছে—আত্মনিয়ন্ত্রণ—আপনা আপনি পরিচালিত হওয়া। জীবনযাত্রায় আমি যদি

অপর কাহারও প্রেরণায় বা তাড়নায় পরিচালিত হই, তবে আমার স্বাধীনতা রহিল কোথায়? আমি ছাড়া অপর কাহারও নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব স্ব'য়ের অধীনতা নহে; কাজেই উহাকে পরাধীনতা বলাই সঙ্গত। এই অপর—স্বজাতিই হউক, আর বিজাতিই হউক। আমার যখন আদেশ নাই, ইচ্ছা নাই, প্রেরণা নাই; আমার জীবন-গতিতে আমার যখন কোন শক্তিরই প্রয়োগ হইতে পায় না, তখন আমি স্বাধীন হইলাম কেমন করিয়া?

ইহার উপর জাতি একটা সমষ্টিগত বস্তু। ইহাতে একের ইচ্ছার প্রয়োগ জাতীয় স্বাধীনতা হইবে কেমন করিয়া? তুমি—আমি নহি, তোমার শক্তি আমাকে যদি নিয়ন্ত্রিত করে, তবে আমার একটা স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব আর রহিল কোথায়? সে তুমি আমার স্বজাতিই হও, আর স্বগোষ্ঠিই হও।

এই একের স্বাধীনতা দশের উপর আরোপিত করিলে, তাহা স্বজাতিনিয়ন্ত্রিত হইলেও—পরাধীনতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বধর্ম্মী রাজ-নিয়ন্ত্রণ ও পরাধীনতা।

জাতি বিভক্ত বস্তু নহে; তবুও জাতি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মানবের সমবায়ে গঠিত। এই স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ পৃথক

মনুষ্যজীবনগুলির পরিপুষ্টিই সভ্যতার, জাতীয়তার ও স্ব-ধর্ম্মের একমাত্র কার্য্য। কোন প্রকারের স্বাধীনতা যদি এই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত করে, তবে তাহা একান্তই পরিত্যজ্য।

রাজশক্তি-নিয়ন্ত্রিত জাতির এই পরবশতা আসিয়া পড়ে। কারণ শুধু রাজ-অনুশাসনেই যন্ত্রের মত তাহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। তাহার পর, গণতান্ত্রিক বলিয়া যে শাসন-প্রণালী আছে, তাহাও ঠিক জনগণের প্রত্যেকটির স্বস্থ ও অনুমোদিত ইচ্ছায় সম্পাদিত হয় না। কয়েকজন মাত্র বিশিষ্ট প্রতিনিধিই জাতির নামে কার্য্য চালাইয়া দেন। ইহাও স্বাধীনতার অবস্থা নহে।

বাঙলায় এমন ব্যবস্থা ছিল না। বাঙালীর জাতীয় জীবন রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিতও নহে, গণতন্ত্র চালিতও নহে ; উহা অন্তঃশাসন শাসিত। সেইজন্যই রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে বাঙালী জাতি ঠিক পরাধীনতার চাপে নিষ্পিষ্ট হয় নাই। একজন রাজা রহিলেও, পরধর্ম্মাবলম্বী শাসক থাকিলেও নিজেদের জাতীয় তরণীখানি গন্তব্যাভিমুখে চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, ঐ অন্তঃশাসন কিরূপ? অন্তঃশাসন বলেই বা কাহাকে?

অন্তঃশাসনের অপর একটি নাম আত্মশাসন, আপনা আপনি পরিচালিত হওয়া। এই নিজে নিজে পরিচালিত হওয়া একটি দুটি দশটিতে নহে—জনে জনে, প্রত্যেকটিতে —জাতি বলিতে যতগুলি মানুষ বোঝায় সব গুলিতে।

বাঙালীর আত্মশাসনের কথা বলিতে গিয়া তাহার ধর্ম্মব্যবস্থার একটু পরিচয় দিতে হইবে। এই ধর্ম্মবোধ বা ধর্ম্ম ব্যবস্থাই অন্তঃশাসনের স্রষ্টা। এখানে এ কথা বলিয়া দেওয়া উচিত, যে বাঙালী বলিতে কেবল হিন্দু বাঙালীকেই বুঝাইতেছে—যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলে। এই সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশেষ কথা—মানুষের ব্রহ্মভাবকে জাগরিত করিয়া তোলা অর্থাৎ স্বাধীন স্ব-প্রতিষ্ঠ খাঁটি মানুষের স্বরূপটিকে ফুটাইয়া তোলা। এই ধর্ম্মের শাস্ত্র আছে, বিধি আছে, ব্যবস্থা আছে, অনুশাসন, আজ্ঞা সবই আছে, কিন্তু সর্ব্বোপরি আছে আত্মপ্রজ্ঞ, আত্মসংস্থ, নির্ম্মুক্ত মানুষের প্রতিষ্ঠা। ইহার প্রধান সাধ্য—"ব্রহ্মাস্মি"। ব্রহ্মই যদি আমি হই, তবে আমার মত স্বাধীন স্বস্থ ও আত্মনিয়ন্ত্রিত আর কে রহিতে পারে? কিন্তু এখানে এ রহস্যটুকু ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আমি স্বতন্ত্র বলিয়া যে আমার ইচ্ছা, আচরণ এবং অনুরাগও স্বতন্ত্র হইবে তাহা

নহে। আমি স্বাধীন ইহা সুনিশ্চিত; কিন্তু আমার যাহা "স্ব", তাহা তোমার সহিত অভেদ একাত্ম। কারণ, "ব্রহ্মৈবাহং" যেমন সত্য, "তত্ত্বমসিও" সেইরূপ সত্য। কাজেই প্রত্যেকের সত্য অনুভূতি, প্রত্যেকের ধর্ম্মবোধ একই আত্মার কথা। ঋষি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতিতে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে, কাহারও স্বতন্ত্রতা ক্ষুণ্ণ হইবে না; কেননা ঋষির স্বরূপ এবং অপরের স্ব—অদ্বৈত, অভেদ। এই জন্য হিন্দু বাঙালী সহস্রবিধ শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলিলেও, ঠিক পরাধীন নহে। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যাহা কিছুই মানুক বা অনুসরণ করিয়া চলুক, অপরের নিয়ন্ত্রনে সে চলে না; কোন ভয়ে বা লোভে তাহার শাস্ত্র-স্বীকৃতি নহে। ইহা তাহার স্বাধীন ইচ্ছারই ফল।

কাজেই প্রত্যেক বাঙালী আত্মশাসনে শাসিত। আবার, তাহার জাতীয় জীবনও বহুধা-বিভক্ত নহে; কেননা, সত্যের নির্দ্দেশও পরস্পর বিরোধী হইতে পারে না। বাঙালী একদিকে স্বাধীন স্ব-নিয়ন্ত্রিত; অপরদিকে সমষ্টি-চৈতন্যেও অ-বিভক্ত—ঐক্যনিবদ্ধ।

এখন কথা ধর্ম্মবোধের স্বাধীনতা—সামাজিক ও

রাষ্ট্রীয়জীবনে কেমন করিয়া প্রযুজ্য হইতে পারে? এইখানে ইহা বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবার কথা যে, বাঙালী যে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার অনুসরণ করিয়া চলে, তাহাতে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র আলাদা কিছু নহে—এক ধর্ম্মেরই সব বিভাগ। ফলে কিছুই পরস্পর বিরোধী নহে। ব্যক্তির জীবনকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতে যাহা সাধ্য ও সেব্য জাতীয় জীবনে তাহাই গ্রাহ্য; কিছু বেশী নহে, কিছু কমও নহে। তাই বাঙালীর ব্যক্তিগত সাধনায় ও সমষ্টিগত সাধনায় কোথাও বাধে না—রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পর বিরোধী হয় না। বাঙালীর সভ্যতায় ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক বলিয়া দুইটা বিভাগ নাই; ইহলোক ও পরলোক একসূত্রে গঠিত। সেইজন্য, যখন একক বাঙালী সমষ্টিবদ্ধ হইত, তখনও তাহার কিছু পার্থক্য আসিত না। কারণ একে আর বহুতে বিভেদ কোথায়? প্রত্যেকেরই মূল উদ্দেশ্য, ব্রহ্মভাবকে জাগ্রত করিয়া তোলা। এবং এই জাগরণের সাধনাতে সামান্য ইতরবিশেষ রহিলেও, বিশেষ বিষমতা কোথাও নাই। সেইজন্যই ব্যষ্টি বাঙালী, সমষ্টি বাঙালীর সহিত একান্তই অভেদ ছিল। প্রত্যেকের আচারে ব্যবহারে ভাবনায় চিন্তায় মূলতঃ একটা সামঞ্জস্য ছিল।

কথা হইতেছে—স্বাধীনতার। স্বাধীনতার ধর্ম্ম—আত্মনিয়ন্ত্রন। আত্মপ্রতিষ্ঠ, মুক্তিপন্থী সাধনায় মানুষ একান্তই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইয়া ওঠে। যাহাকে প্রতিদিন-কার জীবনযাত্রা আরম্ভ করিবার সময় স্মরণ করিয়া লইতে হয়—"অহং দেবো ন চ্যাণ্যোস্মি ব্রহ্মৈবাহং" তাহাকে অপরের আদেশ বা অনুশাসনের উপর নির্ভর করিতে হয় না; সে নিজেই তাহার যাবতীয় কর্ম্ম শ্রদ্ধালুভাবে সাধন করিয়া যায়। এইখানে প্রত্যেক বাঙালী স্বাধীন। আবার প্রত্যেক বাঙালীই ঐক্য-নিবদ্ধ; কেননা, বাঙালীর জীবন-ধর্ম্ম একটিই। বাঙালী যেমন নিয়ন্ত্রনে আপনার কাজ করিয়া যায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার জাতীয় কর্ম্মও সম্পাদিত হইয়া যায়।

এই ত গেল বাঙালীর স্বাধীনতার তথ্যের কথা। এইবার ব্যবহারিক আত্মশাসনের কথা আলোচনা করা যাক।

সমগ্র জাতীয় জীবনের তুলনায় রাষ্ট্র একটি সামান্য অংশ মাত্র। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের যাহা প্রধানতম কার্য্য, তাহা অন্তঃশাসন-শাসিত সমাজের স্বতঃই সাধিত হইয়া যায়। রাষ্ট্র কেবল রাজ্যসম্বন্ধীয় ব্যাপারই নহে; পরন্তু জাতিকে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরিচালিত করাই

রাষ্ট্রের প্রধান কার্য্য। এখন যদি কোন জাতি আপনা আপনি তাহার কর্ত্তব্যগুলি পালন করিয়া যায়, তবে রাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র থাকিলেই বা কি, আর পর-রাষ্ট্র অধীন হইলেই বা কি?

বাঙালী জাতি ঐরূপ অন্তঃশাসন-শাসিত ছিল বলিয়া, তাহার যাবতীয় জাতীয় কর্ম্ম নিজেদের কর্ত্তব্য বোধে পালন করিত বলিয়া, পর-জাতির কর্ত্তৃত্ব তাহাদের পরবশ করিতে পারে নাই। তাহাদের পরাধীনতার একটি মাত্র নিদর্শন ছিল—উহা কর দান। এই কর দানও পরাধীনতা বটে, তবে মারাত্মক নহে। রাজস্বটুকু দিয়াও যদি শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার ক্ষেত্রে জাতীয় আত্ম-কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রহে, তবে সে রাজস্ব দান-টুকুতে বড় কিছু আসে যায় না। আর পরধর্ম্মী পর-রাষ্ট্র যদি কোন জাতির সমাজ ও সভ্যতায় হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তবে তাহাদের বিজয় যথার্থ হয় না। এই জন্য রাষ্ট্র-পরাধীন হইয়াও বাঙালী স্বাধীন ছিল। তাহার জাতীয় জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য সে আপনা-আপনিই সম্পন্ন করিয়া লইত।

যে যুগে বাঙলায় বৈদেশিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, সে যুগেও বাঙলার মানুষগুলি আত্মপ্রেরণায়

তাহাদের মানব কর্ত্তব্যগুলি প্রতিপালন করিত। রাজকীয় আইন ও আদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত না। স্ববশে নিজ কর্ত্তব্য না করিলেই ত রাজা, রাজ-শক্তি ও আইনের আবশ্যকতা হয়!

বাঙালী নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজে করিত, নিজেদের ধর্ম্মানুমোদিত আচার ব্যবহার নিজেদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই প্রতিপালন করিত, সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডগুলি নিজেদের সম্মিলিত দায়িত্ববোধেই সম্পন্ন করিত; এমন কি ব্যষ্টির অপরাধ, যাহা রাজকীয় বিচারে বিচারিত হইবার যোগ্য, তাহাও নিজেদের ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা বিচার করিত। ধর্ম্ম—হিন্দুসভ্যতার মূলভিত্তি বলিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারাই বাঙালীর জাতীয় জীবন পরিচালিত হইত। রাজশক্তির প্রবেশের এমন রন্ধ্র ছিল না, যেখান দিয়া প্রবেশ করিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবনে সত্য অধিকার লাভ করা যায়। ফলে, বাঙলা পর-রাষ্ট্রাধীন হইয়াও স্বাধীন, স্ব-নিয়ন্ত্রিত ছিল।

আত্মশাসন বা অন্তঃশাসন বাঙালীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের স্বভাবধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙলার নিরক্ষর কৃষক

পর্য্যন্ত সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ। বাঙলা পররাষ্ট্র-বিজিত হইলেও জাতীয় স্বাতন্ত্র্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজশক্তির সমাজজীবনে কোন প্রভাব না রহিলেও বাঙালীর সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যথাবিহিতভাবে চলিয়া যাইত, এখন পর্য্যন্ত তাহার রেশ রহিয়াছে।

আজ কাল স্বায়ত্তশাসন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে—আত্মশাসন। বাঙলায় এই স্বায়ত্ত-শাসন আশ্চর্য্য রকমে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। এক একটি পল্লী এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যখণ্ডের মত ছিল। কোন পল্লীর শাসনে পালনে, শিক্ষায়, আচারে অনুষ্ঠানে আর কাহারও অধিকার ছিল না; প্রত্যেক গ্রামখানির কর্ত্তব্যগুলির পরিচালন গ্রামের দশজন মণ্ডলের দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। এখানে ব্যক্তির কথা ধরিয়া কাজ নাই; যখনই কোন সামাজিক তথা জাতীয় কর্ত্তব্য সমুপস্থিত হইত, তখন গ্রামের সকলেই মিলিত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্য ও শুভবুদ্ধির সাহায্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলিত। সেই সম্মিলনে যদিও কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেতৃস্বরূপে পরিচালনা করিতেন, তথাপি গ্রাম্য সকলেই অভিমত দিবার অধিকার পাইত। এমন গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন-

পদ্ধতি জগতের অপর কোন জাতির মধ্যে বিকাশ লাভ করে নাই।

বাঙালীর অন্তঃশাসনের পরিচয় ভাল করিয়া লইতে হইবে। কেননা, উহাই স্বাধীনতার সত্য স্বরূপ।

# ডাকাত বাঙালী

সূর্য্যের উপর মেঘচ্ছায়ার ন্যায় ঐতিহাসিক সত্যের উপরও কখন কখন আবরণ পড়িয়া যায়। বাঙলার ঐতিহাসিক সত্যের উপর এমনি একটা কৃষ্ণ যবনিকা পড়িয়াছে। তাহাতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী যুগের বাঙালীর মূর্ত্তিটা কদর্য্য ত হইয়াছেই, উপরন্তু এই আরোপিত মিথ্যা কদর্য্যতার প্রভাব ভবিষ্যৎ বাঙালীর চিত্তকে স্বজাতির প্রতি বিশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মুসলমান রাজত্বের অবসান কালে এবং ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বভাগে, বাঙালীর শ্রেণীবিশেষ ডাকাত হইয়াছিল। তাহারা পথিকের ধন প্রাণ হরণ করিত, গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, তাহারা সমাজের পক্ষে একটা বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইহা ঘটনার দিক দিয়া কতকটা সত্য; কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া তখনকার দিনের বাঙালী চরিত্রের সমালোচনা সম্ভব হইবে না এবং উচিতও হইবে না। কারণ, তখনকার অরাজক অবস্থার সহিত জাতি-জীবনের

তুলনামূলক আলোচনা হইয়া, সেদিনের বাঙালী চরিত্রের সমালোচনা ও ঐতিহাসিক সত্যের নির্দ্ধারণ হওয়া কর্ত্তব্য।

কেবল মাত্র কৃতকর্ম্ম দেখিয়া মানব চরিত্রের ও জাতি-জীবনের বিশ্লেষণ করা অনুচিত। উহাতে সত্য আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং অনৃত—সত্য বলিয়া প্রচারিত হওয়ায় জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের বিঘ্ন ঘটে।

মুসলমান শাসনের অন্তিমকালীন রাষ্ট্রবিপর্য্যয়ের দিনে বাঙালীকে বাধ্য হইয়া ডাকাত হইতে হইয়াছিল, ইহার জন্য তখনকার রাষ্ট্রীয় অবস্থাই বিশেষভাবে দায়ী।

বাঙলায় যাহারা ডাকাত হইয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই শ্রমিক শ্রেণীর। ক্ষেত্রবিশেষে অভিজাত সম্প্রদায় ইহাদের নেতৃত্ব করিতেন। যে সকল লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ডাকাতিতে লিপ্ত রহিত, তাহারা তখনকার রাজকীয় সৈন্য বিভাগে নিয়োজিত রহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। কেহ কেহ বা ভূম্যধিকারীর বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পাইক ও লাঠিয়ালগিরি করিয়া বৃত্তি পাইত। মোটের উপর শারীরিক বলচর্চ্চাই ইহাদের মুখ্যতম কার্য্য ছিল। আর তখনকার

দিনের সামাজিক রীতিতে শৌর্য্যবীর্য্যানুশীলনের সহস্রবিধ সুবিধা থাকায়, যাহারা শক্তিমান হইত, সমাজে তাহাদের একটি সুবিধাজনক ও মর্য্যাদাজনক স্থান হইত।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্ব এবং প্রথম কালটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিন। তখন পূর্ব্ব রাজশক্তি মুসলমান মাত্র রাজা সাজিয়া আছেন, তাঁহাদের শাসন এবং পালনের সামর্থ্য নাই; আর সমাগত নূতন বৃটিশ শক্তি তখন পূর্ণ বণিকভাবে ভাবান্বিত। ইংরেজ তখন বাঙলার রাজদণ্ড হাতে পাইয়াই স্বজাতির সুবিধাজনক বাণিজ্য ব্যবস্থায় ব্যাপৃত। তখন এমন একটি সুনিয়ন্ত্রিত শাসনশক্তি নাই, যাহা উচ্ছৃঙ্খল ও বিচ্ছৃঙ্খল সমাজকে সুপরিচালিত করিতে পারে।

বাঙলার জমীদার শ্রেণী—যাঁহাদের হাতে সেদিনের সমাজ ব্যবস্থার ভার ছিল, তাঁহারা এই রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ের ফলে অনেকেই বিপর্য্যস্ত-ভাগ্য হইয়াছিলেন; অনেকে জাতীয় কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া এই অব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করিয়া ভাগ্য পরিবর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছিলেন; আর কেহ কেহ বা বাঙলার পূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় ব্রতী হইলেন। ফলে, সমগ্রজাতির নিয়ন্ত্রনের দায়িত্ব

কাহারও উপর রহিল না। ভাগ্যান্বেষী যাঁহারা, তাঁহারা নব বিজয়ী বৃটিশের পক্ষে যাইয়া স্বার্থ সাধনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান বাঙলার কয়েকটি জমিদার বংশ তাঁহাদেরই উত্তর পুরুষ। আর যাঁহারা পূর্ব্ব রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত-শক্তি হইলেন। আর যাঁহারা পূর্ব্ব ও নূতন উভয় শক্তিকে অস্বীকার করিয়া নূতন বঙ্গের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন, তাঁহারাও বৃটিশ-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পরাজয়ের অতল জলধিতলে ডুবিয়া গেলেন।

এই স্বাধীনতা-পন্থীদিগের অগ্রণী যাঁহারা, তাঁহারাই বাঙালার অভিজাত ডাকাত। প্রতিপক্ষ রাজশক্তি ও বৈদেশিক ঐতিহাসিক, বাঙালার শৌর্য্য-সূর্য্যের উপর এই কলঙ্ক কালিমা বিছাইয়া দিয়াছে। মুসলমান অভ্যুদয়ের দিনে এই স্বাধীনতা-পন্থীদেরও ডাকাত বা বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাণাপ্রতাপ, মহারাষ্ট্র কেশরী শিবজী, বঙ্গগৌরব প্রতাপাদিত্য এই বিদ্রোহী অভিজাত দস্যু। যাঁহাদের বীর্য্য-বিভূতি সেকেন্দর, নেপোলিয়ঁ অপেক্ষাও গরিষ্ঠ, যাঁহাদের অধিষ্ঠানভূমি এক একজন সাম্রাজ্য স্রষ্টার অপেক্ষাও

সমুচ্চ স্থানে, যাঁহাদের রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ও সামরিক বিচারের পরিমাপেই নহে, পরন্তু যাঁহারা এক একজন মহাপুরুষের সমতুল্য, তাঁহারা শুধু পরাধীনতার পাপে অখ্যাত কুখ্যাত ভাবে রহিয়া গিয়াছেন।

বিগতকালের রাষ্ট্রবিপ্লবে বাঙলায় এইরূপ অনেক ডাকাত জমিদার ছিলেন। ইঁহারা অনেকেই ডাকাত অথচ দস্যু নহেন; ইঁহারা কেহই লুণ্ঠনধর্ম্মী বা উৎপীড়ক প্রকৃতির ছিলেন না বলিয়াই বলিলাম, যে ইঁহারা ঠিক দস্যু ছিলেন না। এই সব অভিজাত শ্রেণীর ডাকাত জমীদার চাহিয়াছিলেন—বাঙালায় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান। ইঁহারা মুসলমানকেও স্বীকার করিতে পারেন নাই, আবার নবাগত ইংরেজকেও পরিবর্জ্জন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের স্বাধীনতার প্রচেষ্টাও ডাকাতি আখ্যা পাইয়াছিল।

আর এক প্রকার অভিজাত ডাকাতও ঐকালে দেখা যায়। তাহারা ভাগ্যান্বেষী। সমাজে কতকগুলি লোক একটু অধিক পরিমাণে ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি চাহিয়াই থাকে; যাহারা চায়, তাহারা দেখিল দেশ অরাজক, ঠিক শাসন ও পালন হইতেছে না, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ শুধু রাজস্ব লইয়া। যে রাজা ছিল, সে গত-

শক্তি, প্রজা উৎপীড়ন করিয়া অপরের হাতে খাজনা তুলিয়া দেয় এবং নিজে বিলাসে মাতিয়া থাকে। এমন অবস্থার সুবিধা লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ঐশ্বর্য্যকামী বুদ্ধিমান সম্প্রদায় দেখিলেন, এতদিন যাহারা রাজা ছিল, তাহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আর ফিরিয়া আসিবে না, যাহারা রাজার স্থান অধিকার করিল, তাহারা রাজা নহে, বণিক্ মাত্র; অতএব এখন ধন সংগ্রহই বিহিত কাজ।

এই সম্প্রদায় ধনবৃদ্ধির জন্য তখনকার যাঁহারা বিত্তবান ছিলেন, তাঁহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। ইঁহাদের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল; কেবল ইঁহাদের পেয়াদা পাইক ও লাঠিয়ালেরাই ডাকাত আখ্যা পাইয়াছিল। অভিজাতশ্রেণীর ডাকাত বলিয়া যাহারা পরিচিত এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বাধীনতাপন্থী ছিলেন, তাঁহারা স্বজাতি ও সমাজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন পুরাতন উভয় রাজশক্তির বিরোধিতা করিয়াছেন। ইঁহারা রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়াছেন, রাজভাগ কাড়িয়া খাইয়াছেন, এবং নিজেরা ন্যায্য রাজস্ব বন্ধ করিয়া স্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। মুসলমান যুগের শেষকালে সীতারাম রায় ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম

ডাকাত। ইংরেজের প্রথম আমলে "আনন্দমঠে" যে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহের' উল্লেখ আছে, তাহাও ঐ ডাকাত এবং ডাকাতি। ইঁহাদের অন্তরে নিখিল বাঙলার স্বাধীনতামূলক আদর্শ ছিল কিনা বলা যায় না, তবে তাঁহারা বাঙলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাকল্পে যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাই ডাকাতি নাম পাইয়াছে।

তখনকার বাঙলা সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও, বাঙলার সিংহাসনে একজন দণ্ডধারী রাজা রহিলেও, বাঙালী তখন স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীনতার একটু বিচিত্র ইতিহাস আছে।

বাঙলার প্রদেশ-তান্ত্রিক স্বাধীনতা ছিল; শাসন-কর্ত্তা সম্রাটের অধীন হইলেও নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব (অর্থ ও সৈন্য) দিয়া স্বকীয় রাষ্ট্রনীতিতে ও প্রভুত্বে প্রদেশ শাসন করিতেন। এই রীতি—প্রদেশ-শাসন হইতে গ্রাম্য ব্যবস্থায় পর্য্যন্ত অনুস্যূত হইত। গ্রাম্য-মণ্ডল বা মণ্ডলী জমিদারের নির্দ্দিষ্ট খাজনা যথারীতি চুকাইয়া দিয়া গ্রামের শাসন ও পালন নির্ব্বাহ করিতেন। ভূম্যধিকারীও ঠিক ঐ পদ্ধতিতে তাঁহার অধিকারে কাজ করিয়া যাইতেন।

এই সকল ভূস্বামীদের মধ্যেই অনেকে স্বাধীনতা

স্থাপনের কামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজত্বকালে যেমন সীতারাম রায় প্রভৃতি বাঙলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী পুরুষ, ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কালেও তেমনি অনেকেই ছিলেন, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ডাকাতি আখ্যায় অভিহিত হইয়া গিয়াছে।

বাঙলার তথা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের ডাকাত অনেকদিন হইতেই বলা হইতেছে। হিন্দু স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাতা মহারাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি শিবজী, রাণাপ্রতাপ ও প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি সকলেই বিদ্রোহী অথবা একেলে কথায় ডাকাত।

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কারণে অভ্যুদিত সম্প্রদায় নব অভ্যুদিত বৃটীশ প্রভুত্বে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাদের অধীনে যে সব পাইক পাহারা, লাঠিয়াল, বরকন্দাজ ছিল, তাহারা আশ্রয়হীন হইল। নব শাসন-যন্ত্রের সুপরিচালনের সঙ্গে সমাজে তাহাদের কোনই স্থান রহিল না। যাহারা পূর্ব্ব অভ্যাস বর্জ্জন করিয়া ও সামাজিক বাধা দূর করিয়া সমাজে স্থান লাভ করিতে পারিল, তাহারা করিল; যাহারা পারিল না, তাহারা পরিবার ভরণ পোষণের জন্য,

এমন কি নিজের উদরান্ন সংস্থানের জন্য ডাকাতি করিতে বাধ্য হইল।

বাঙলীর ডাকাত হইবার আরও একটি সঙ্গত ও অপরিহার্য্য কারণ ছিল। সাধারণ মনুষ্যচরিত্র অভ্যাস ও সংস্কারের দাস। ইহা এড়াইয়া উঠা কষ্টকর, এমন কি দুঃসাধ্য। এই অভ্যাস ও সংস্কারের জন্য একশ্রেণীর বাঙলীকে ডাকাত হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

বাঙলার কতকগুলি লোক শরীরজীবী ছিল অর্থাৎ গতর খাটাইয়া নহে—বল বিক্রমের চর্চ্চায় উদরান্ন সংস্থান করিত। ইহারা সৈনিকের বৃত্তি লইয়া পাইক, লাঠিয়াল, দ্বারবান হইয়া নিরন্তর ঐ যুদ্ধবিগ্রহের কাজেই লিপ্ত রহিত। তাহারা ঠিক সাধারণ গৃহস্থের সহজ জীবনযাপনা প্রণালীতে অনভ্যস্ত হইয়া পড়িত। এই বলিষ্ঠশ্রেণী রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়ে তাহাদের চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমি হারাইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্থিকতার দিক দিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল।

কেননা, পুরাতন রাজশক্তি শক্তিহীন হওয়ায় সেখানে ইহাদের কোন ঠাঁই রহিল না; নূতন রাজতন্ত্র বিদ্রোহের আশঙ্কায় পরাজিত পক্ষের

অকর্ম্মণ্যতায় অক্ষম বলিয়া ইহাদের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিল না। জমিদার প্রভৃতির অধীনে যাহারা কর্ম্ম করিত, তাহারাও জমিদারের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে কর্ম্মহীন হইল। নূতন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় বাঙালীর অন্তঃ-স্বাধীনতা—যাহা সমাজে বহুদিন হইতে অচল-প্রতিষ্ঠ ছিল, তাহার উচ্ছেদ হইল। বিজয়ী বৃটীশ—রাজতক্ত ও রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া ক্রমশঃই বাঙালী জাতির জীবনে যেখানে যাহা কিছু আত্মকর্তৃত্ব ছিল সবই কাড়িয়া লইলেন। জমিদার ইংরেজ সরকারে রাজস্ব পৌঁছিয়া দিবার যন্ত্র হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের এত দিনকার যে শাসন পালনের অধিকার ছিল, তাহা হস্তচ্যুত হইল। গ্রাম্য পঞ্চায়তি পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়া হইল। মোটের উপর জাতির দীর্ঘ দিনের স্বাতন্ত্র্যের 'স্ব'এর নাম গন্ধ কোথাও অবশিষ্ট 'রহিল' না; এবং সুশাসন ও শান্তির স্পর্শে দেশের মানুষগুলি এমন জড়বৎ হইয়া উঠিল যে, যাহারা পূর্ব্ব রাজা বা জমিদার কাহারো পক্ষভুক্ত হইয়া লড়াই করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে উপেক্ষিত হইল। স্বাধীন দেশে যাহার নাম হইত বীরত্ব, এখানে তাহা উপাধি পাইল ডাকাতি।

এখন এই উপেক্ষিত মানুষগুলি করে কি? তাহারা

কাজ পায় না, খাইতে পায় না ; তখন কোন উপায়ান্তর না পাইয়া যাহার সাহায্যে এতদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, সেই বৃত্তিই অবলম্বন করিল। তবে তাহার নাম হইল ডাকাতি। ডাকাতি এবং যুদ্ধে বড় বেশী প্রভেদ নাই। অপেক্ষাকৃত বলীয়ানের ডাকাতির নামই যুদ্ধ।

যদি তখনকার নবাগত ইংরেজ রাজশক্তি বাঙলার যুদ্ধজীবি সম্প্রদায়কে সৈন্যশ্রেণীরভুক্ত করিত, যদি ভূস্বামী সম্প্রদায়ের হাতে আত্মশাসনের ক্ষমতা রহিত, এবং তাঁহারা ঐ সব শৌর্য্য বীর্য্যশালী লোকদিগকে বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যে নিয়োগ করিতেন, তবে ডাকাত বাঙালীর উদ্ভব হইত না। বাঙালী ডাকাত হইয়াছিল, তাহার চারিত্রিক অপবিত্রতার জন্য নহে, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং নব রাজ-শক্তির ঔদাসীন্যে।

বাঙলার যে ডাকাতির ইতিহাস এখনো প্রাচীনদের কাছে শোনা যায়, তাহাতে প্রকাশ, যে ঐ সব ডাকাতি নিছক দুষ্কৃত নহে, উহার পিছনে অনেক সেবাব্রত ও যথার্থ মনুষ্যধর্ম্মী খাঁটি মানুষের অন্তঃকরণ ছিল। এই সব ডাকাতির অর্থে অনেক দুঃস্থ গৃহস্থ প্রতিপালিত হইত।

যাহা হউক, ডাকাত বাঙালী খুব অগৌরবের নহে, যেটুকু অগৌরবের আছে, তাহার অধিকাংশই প্রাপ্য তখনকার রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের। অন্যে না দেখুক, বাঙালী যদি শ্রদ্ধার চক্ষে তাহার জাতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করে, তবে দেখিবে বাঙালার যাহা কলঙ্ক, তাহার অভ্যন্তরেও প্রকৃত গৌরবের দীপ্তি উদ্ভাসিত রহিয়াছে।

# স্বাধীন বাঙলার সমবায়

আজকাল সমবায় বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। এই যন্ত্রপ্রধান যুগে ঐ প্রথাও কতকটা যান্ত্রিক ব্যাপার। আইন করিয়া নিয়ম করিয়া ঐ সমবায় পদ্ধতি চলিতেছে। তাহার উপর উহা ভগ্নাঙ্গ সমবায়। উহা সমগ্র জাতির সম্মিলনে সম্মিলিত নহে। যাহারা সমর্থ—সুবিধা পাইয়া আসিতেছে, সুবিধা পাইতে ও লইতে জানে, বর্ত্তমান সমবায় প্রণালী কেবল মাত্র তাহাদেরই 'জন্য।' ইহাতে যাহারা সমবায়ের সুবিধা পাইবার যথার্থই অধিকারী তাহারা বঞ্চিতই রহিয়া যাইতেছে।

স্বাধীন বাঙলার সমবায় প্রণালী ছিল ইহার বিপরীত। মানব যেমন হৃদয়বৃত্তিপ্রধান জীব, ইহাও তেমনি সহৃদয়তাউদ্বুদ্ধ। স্বাধীন বাঙলার মানুষগুলি যেমন আত্মীয়স্বজনের প্রতি মমতাময় ব্যবহার করিত,

সমাজের সর্ব্ববিধ শ্রেণীর সহিতও তেমনি হৃদ্যভাবে আদান প্রদান করিত। সমবায়—স্বাধীন বাঙালীর জীবনে একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ হইয়াছিল।

স্বাধীন বাঙলার সমবায় দুইটা রূপ লইয়া আত্ম-বিকাশ করিয়াছিল। এক পারিবারিক, আর এক সামাজিক। পারিবারিক সমবায় প্রত্যেক ব্যক্তি-জীবনের সাধ্য বস্তু ছিল। সামাজিকভাবে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ত আছেই; কিন্তু ঐ সমষ্টিগত অনুষ্ঠানের উপযুক্ত হইবার জন্য, ব্যক্তিগত আচরণের প্রয়োজন। আর ব্যক্তির প্রস্তুতিই সমষ্টির কর্ত্তব্যের প্রধান লক্ষ্য।

বাঙলার যে ব্যক্তিগত সমবার প্রথা ছিল, তাহার মধ্যে মানুষের ধর্ম্মপয়ায়ণতাই অনুস্যূত হইত। অর্থাৎ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার ব্যবহার, আত্মীয়ের সহিত আত্মীয়ের আচরণ যেমন হইতে পারে, উহা তেমনই ছিল।

হিন্দুর সমাজে শ্রেণী বিভাগ আছে অর্থাৎ বর্ণ বিভাগ আছে; কাজেই বাঙালী হিন্দুর জাতীয় জীবন দেখিলে প্রথমতঃই মনে হয়, উহা বিখণ্ডিত, বিভক্ত—বর্ণ ভেদে বুঝি বা অর্থ ভেদও করিয়াছে; উচ্চ এবং নীচ বর্ণে বুঝি বা পার্থক্য রহিয়াছে। বাস্তবিক

ব্যাপার তাহা নহে। বাঙলার সমগ্র সমাজটি এক-সূত্রে গ্রথিত

সমাজ বিন্যাসের বাহ্য দিক দিয়া বাঙলায় উচ্চ নীচ ভেদ আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের দিক দিয়া সকলে সমপ্রাণ। অভিজাত বাঙালী বিত্তবিভবে শ্রেষ্ঠ হইয়াও অন্ত্যজ বাঙালীকে ক্রীতদাস করেন নাই। যাহারা অন্ত্যজ জাতি তাহারা অধিকাংশ অভিজাতের জোত্র জমি চাষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। পাশ্চাত্য দেশে বিভবশালী ব্যক্তিগণ যেমন শ্রমিক শ্রেণীকে খাটাইয়া কৃষিকর্ম্মে বা ব্যবসায়ে অধিক অর্থ অর্জ্জন করে; শ্রমিক যাহারা—তাহারা যেমন বিত্তহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, গৃহহীন দিনমজুরই রহিয়া যায়, বাঙলার অন্ত্যজ শ্রমিক তেমন নহে; তাহারা ধনীর ভূমি চাষ করিয়া ধনীর সহিত আধাআধি উৎপন্ন ফসলের ভাগ লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থের মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বাঙলার অন্ত্যজ ইউরোপের শ্রমিকের মত ধনীর ক্রীতদাসও নহে, আবার ছন্নছাড়া গৃহহীনও নহে।

ইহা বাঙলার সমবায়ের একটী শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। তাহার উপর ধনী উৎসব আয়োজন করিয়া প্রত্যেককে

তাঁহার অর্থের অংশীদার করেন; আর যাহার অর্থ-সঙ্গতি তেমন স্বচ্ছল নয়, সে শারীরিক শ্রম দিয়া, শ্রমোৎপন্ন ফসল দিয়া যথাসাধ্য সংযোগ সূত্র রক্ষা করিয়া চলে। ধনী যেখানে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া মিলনকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, শ্রমিক সেখানে গাছের একটা লাউ দিয়া, একটা কুমড়া দিয়া তাহার প্রতিদান দেয়।

একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই লাউ কুমড়ার সহিত অর্থের বিনিময় যথার্থ সমবায় হইতে পারে কি না? প্রথম উত্তর—পারে না। মমতাহীন আইন-মূলক সমবায় পদ্ধতিতে এমন অসঙ্গত মিলন সম্ভব নয়। আবার সম্ভব হয়, অন্তরের দিক দিয়া। পরস্পর স্নেহ ও শ্রদ্ধা রহিলে একটা প্রণতি—একটা রাজ্যখণ্ড দানের অপেক্ষাও গরিষ্ঠ হয়, একটা আশীর্ব্বাদ—মণিমাণিক্য উপহারের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়। তাই বাঙালীর সমবায়ে কখন অসঙ্গতি দোষ আসে নাই। ছোট বড়কে শ্রদ্ধা করিত, বড় ছোটকে স্নেহ করিত। এমনিভাবে ছোটয় বড়য় মিলিয়া মিশিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনটা—এক জীবন হইয়া উঠিয়াছিল।

বাঙালীর সমবায়ের ইহা একটা দিক মাত্র। ইহার একটা বাহ্যিক দিক রহিয়াছে।

বাঙালী শাস্ত্রশাসিত জাতি। তাহার জাতীয় জীবন শাস্ত্রীয় বিধি বিধানের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়। বাঙালী হিন্দুর শাস্ত্র একটা ব্যক্তিগত এবং একটা সমষ্ঠিগত সাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছে। ব্যক্তি বাঙালীকে সমষ্টি বাঙালীর সহিত এক সঙ্গে চলিতে হয়। তাই বাঙালীর জাতক্রিয়ার সহিত অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া—এমন কি শ্রাদ্ধক্রিয়ার পর্য্যন্ত সামাজিক সংযোগ রহিয়াছে। বাঙলার শিশু-সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন কেবল পিতামাতারই আনন্দ হয় না, সমাজের আরও দশজনকে লইয়া সেই জন্মোৎসব নির্ব্বাহ হয়।

বাঙলার সমাজ অঙ্কে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই সেই সমাজের সহিত সংযোগ রাখিতে বাধ্য। কোন বাঙালীর জীবন যাত্রা একাকী নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না, এমনই বাঙালীর জাতীয় ধর্ম্মের বিধি বিধান। আর এই সম্মিলন কোন সম্প্রদায় বিশেষকে—কেবল উচ্চ বর্ণকে অভিজাত গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে লইয়াই নহে, পরন্তু সমাজের যে যেখানে আছে—সকলকে লইয়াই। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বিষয়টিকে পরিচিত করাইতেছি।

প্রত্যেক হিন্দু বাঙালীকে কতকগুলি নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহা পরিহার করিয়া

কোন বাঙালীর সমাজ জীবনে ঠাঁই নাই। প্রত্যেক হিন্দু বাঙালীকে জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া পর্য্যন্ত করিতে হইবে। ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারিবে না; ঐশ্বর্য্যবানও ইহা করিতে বাধ্য, দরিদ্রও করিতে বাধ্য। যে কেহ হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বাঙলার সমাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে সে-ই বাধ্য। নৃপতি বা বিত্তবান বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিবেন, কিন্তু যে নিরন্ন তাহাকে বালির পিণ্ডও দিতে হইবে।

এখন এই যে, ক্রিয়াকাণ্ডগুলি, ইহা ব্যক্তিগত খেয়ালে বা ইচ্ছায় হইবে না। কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিশেষ প্রথাতেও হইবেনা, হইবে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি বিধানের উপর নির্ভর করিয়া। আর ঐ শাস্ত্রীয় বিধি বিধান প্রত্যেক অনুষ্ঠানের এমন নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাহাতে কাহাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

প্রত্যেক অনুষ্ঠানটিতে ব্রাহ্মণ হইতে শিল্পী, বণিক, শ্রমজীবী সকলেরই সাহচর্য্য শ্রম ও সম্মিলন অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

হিন্দুবাঙালী মাত্রকেই পূজা পার্ব্বণ করিতে হয়। এই পূজার একটা অংশ—ব্যক্তিগত সাধনা, অন্যটি সামাজিক ( communal ) ব্যাপার; ব্যক্তিগত সাধনার

সহিত সমষ্টিগত সংযোগ-সূত্রকে ভেদ করিবার উপায় নাই। পূজা করিলে পূজক যেমন ভাবেই আত্মানুশীলন করুন, তাঁহাকে পূজার অঙ্গ-স্বরূপে সমবায়মূলক কতকগুলি অনুষ্ঠান করিতেই হইবে। ইহা অপরিহার্য্য ব্যাপার। যে কোন একটি পূজায় ব্রাহ্মণের আবশ্যক, মূর্ত্তি গঠনের জন্য সূত্রধর কিম্বা কুম্ভকারের প্রয়োজন, পুষ্প ও সজ্জার জন্য মালাকরের প্রয়োজন, বাদ্যের জন্য বাদ্যকর আবশ্যক; এমনই বিবাহ পূজা জাতকর্ম্ম বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বাঙালীর সমাজের উচ্চ-বর্ণ হইতে নিম্নবর্ণ পর্য্যন্ত সকলেরই ঠাঁই আছে। একজন হিন্দুবাঙালীর তাহার সমাজের কোন একজনকে ত্যাগ করিয়া চলিবার কোন উপায় নাই। এমন সমবায়মূলক সমাজ-বিন্যাস পদ্ধতি এই ধনবিজ্ঞানসৃষ্ট সমবায়ের অপেক্ষা সুন্দর নহে কি?

বাঙালীর সমবায়ের আরও রহস্য আছে, ইহাতে বিরোধের—প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঠাঁই মাত্র নাই। বাঙালীর কুলধর্ম্ম ও কুলকর্ম্মকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। "যেনাস্য পিতরো যাতাঃ" বাঙালীকে সেই পথ অনুবর্ত্তন করিতেই হইবে। এই সূত্রানুসারে বাঙালীর জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

বাঙলার সমাজের নিয়ম—যিনি যাহার পূজা করেন, তিনি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক পূজারী এবং পুরোহিত ; এমনি কুম্ভকার, কর্ম্মকার, ক্ষৌরকার, বাদ্যকর প্রভৃতিতেও। ইহাতে সংযোগ এবং সমবায়টা অব্যাহত থাকে, হৃদ্যতা ও মিলন ক্রমশঃ গাঢ় হয়। সেইজন্যই দেখা যায়, বাঙালী ঐশ্বর্য্যবানের সন্তান একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ত্যজ শ্রমজীবীকে ও শ্রদ্ধা করিতেছে, আবার একজন নিরক্ষর শ্রমিকও সমাজের অভিজাতগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেছে। কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে না, কেহ কাহারও হিংসা করিতেছে না। পাশ্চাত্য দেশের জিঘাংসামূলক পাশবিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বাঙালীর মধ্যে নাই বলিলেই হয় যদিও বা থাকে, তাহা নগণ্য।

প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমবায়েয় অন্তরায়। বাঙালীর সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত বলিয়া বাঙলার সমবায়পদ্ধতি অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুশাসন— প্রত্যেককে প্রত্যেকের বর্ণধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিতে হইবে.কাজেই কোন বাঙালী কোন বাঙালীর কোন ব্যবসা ও বৃত্তির প্রতি প্রলুব্ধ হইতে

পারে না। যে যাহার যথানির্দ্দিষ্ট কাজই করিয়া যায়। ফলে, সমবায়ের কোন বিঘ্নই ঘটে না। এইরূপে বাঙালীর সমবায় একটি মমতা-মধুর ভাব লইয়া সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং মৈত্রী ভাব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল।

# স্বাধীন বাঙলার রূপ

স্বাধীন বাঙলার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই স্বাধীন বাঙলার সেই মহিমাময়ী মূর্ত্তিখানিও মনে নাই। কিন্তু বিস্মৃতির যবনিকা ঘুচাইয়া আবার বাঙালীর মানস-ক্ষেত্রে স্বাধীন বাঙলার রূপকে ধ্যানগোচর করিতে হইবে। নহিলে স্বাধীন বাঙলা সম্ভব হইবে কি রূপে?

আজিকার এই হতশ্রী, ভীতিবিহ্বল, মৃত্যুম্লান, শতধা বিভক্ত বাঙলাকে দেখিয়া স্বাধীন বাঙলার কল্পনা করা অসাধ্য প্রায়। কিন্তু বাঙলা যখন স্বাধীন ছিল, স্বস্থ ছিল, তখন তাহার রাজৈশ্বর্য্য অনুপম ছিল। সেই রূপের পরিচয় আজও পাওয়া যায়। পাওয়া যায়—প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে। সে সাহিত্যের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, ছত্রে ছত্রে বাঙলার রূপের চিত্র সুচিত্রিত। সেই রূপ দেখাইতে হইলে সমগ্র প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যই উদ্ধৃত করিতে হয়। তাই প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাধীন

বাঙলার যে রূপ চিত্রিত রহিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত-মাত্র দিয়া রাখিলাম।

কাব্যকল্পনাপ্রসূত ; কল্পনা কিন্তু বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই স্ফূর্ত্তি পায়। কবির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হইতেই কাব্যের বিষয় কল্পিত হয়। কবি-কঙ্কণচণ্ডী কমবেশী সাড়ে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের রচনা। বেশী দূর যাইবার প্রয়োজন নাই, এই সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙলা কেমন ছিল, তাহা কবি-কঙ্কণচণ্ডী হইতেই দেখাইতেছি। চণ্ডী কাব্যে ৺মুকুন্দ-রাম চক্রবর্ত্তী গ্রামের ছবি আঁকিতেছেন ঃ—

"দেখিতে সুধার সারি, ব্রাহ্মণের আগুসারি
সারি সারি বিষ্ণুর সদন।
কনক কলস চূড়ে, নেতের পতাকা উড়ে,
গৃহশিরে শোভে সুদর্শন।
কোন দ্বিজ অধিষ্ঠাতা, কোন দ্বিজ কহে কথা,
কেহ পড়ে ভারত পুরাণ।
নানা দেশ হৈতে আসে, পড়ুয়া বিদ্যার আশে"

ইত্যাদি। এমনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ নবশাক ও ইতর জাতিগণের বসতি ও সুবিন্যাস লইয়া গ্রামের পরিকল্পনা। স্বাধীন বাঙলার নগর বা গ্রাম যে

সুবিন্যস্ত ছিল, একটি কথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ঃ—* * * * বারবধূ জন বসে, এক পাশে তার অধিষ্ঠান।"

স্বাধীন বাঙলার ধর্ম্ম, বলবীর্য্য, ধনদৌলত, বাণিজ্য-বেসাতি সবই ছিল। চণ্ডীতে দেখি ঃ—

"তুলিয়া আখড়া ঘরে, মল্লযুদ্ধ কেহ করে,
মালবিদ্যাগুলী চাপগারি।
লইয়া ঢাল খাঁড়া, কেহ করে তোলা পাড়া"

আবার ব্যবসায় বাণিজ্যে দেখি ঃ—

"বৈশ্য বসে মহাজন, কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ,
কৃষি-কর্ম্ম করে গো-রক্ষণ।
কেহ কালন্তর লয়, বুষে কেহ ধান্য বয়,
কালে কিনে রাখে কোনজন।
কেহ দর করি তোলা, হীরা নীলা মতি পলা,
নানাদেশ ভ্রমে স্থানে স্থানে।"

স্বাধীন বাঙলাকে দেখিলেই স্বর্গের ছবি মনে পড়াইয়া দেয়। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বলতা, শুচিতা, বীর্য্যবত্তা ও পৌরুষ ; সর্ব্বত্রই সুপ্রতুল অবস্থা।

আজ শুনি বাঙলার তিরানব্বই জন মূর্খ। কিন্তু স্বাধীন বাঙলায় এ উৎকট মূর্খতা ছিলনা, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার মুকুন্দরাম বলিতেছেন :—

"প্রসন্ন সবারে বাণী, লেখা পড়া সবে জানি,
সর্ব্বজন নগরের শোভা।"

যে দিকে দেখি, যে দিকে তাকাই স্বাধীন বাঙলা ভাস্বর, প্রদীপ্ত। আজ বাঙালীর লজ্জা নিবারণ করিতে বিদেশীর দ্বারস্থ হইতে হয়, কিন্তু স্বাধীন বাঙলায় :—

"শত শত একজায়, গুজরাটে তন্তুবায়,
ভুনি ধুতি বুনে যোড় গড়া।"

আজিকার বাঙালীর মত হতভাগ্য, সর্ব্বস্বহারা জাতি আর আছে কিনা জানি না। বর্ত্তমানের বাঙালীর বীর্য্যবল, অর্থ-সম্পদ, ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই নাই। কিন্তু সে দিনের স্বপ্রতিষ্ঠ বাঙলায় যে সবই ছিল, চণ্ডীকাব্য হইতেই তাহার পরিচয় দিতেছি। কালকেতু বুলান মণ্ডলকে বলিতেছে :—

"আইস আমার পুর, সন্তাপ করিব দূর,
কাণে দিব কনক কুণ্ডল।"

ইহা নগর স্থাপনের জন্য প্রজাকে আহ্বান। দেশের মধ্যে কতখানি সাচ্ছল্য রহিলে, এমনি সুখের

প্রলোভন দিয়া প্রজা বসাইতে পারা যায়! অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই জাতির উন্নতির প্রাথমিক পরিচয়। সে পরিচয় স্বাধীন বাঙলায় সুপরিস্ফুট। প্রজারা "কেহ কলন্তর নয়।" "কলন্তর" অর্থে দরিদ্র। চণ্ডীকাব্যে যেখানে ইতর জাতিদেরও বর্ণনা আছে, সেখানেও দেখিতেছি, সকলেই বিত্তবান, সুখী পরিবার।

"মাছুয়া নিবসে পুরে, জাল বুনে মৎস্য ধরে,
কোঁচগণ বসে লীলা রঙ্গে।"

অন্ত্যজ শ্রেণীরও সকলেরই "লীলারঙ্গে" দিন যাইত। তখন স্বাধীন বাঙলায় দরিদ্র যে ছিলনা, তাহা সুনিশ্চিত। সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে খাইতে পরিতে পাইত। তবে আধুনিক বিলাসিতার মাপ-কাটিতে সে অবস্থাকে দরিদ্রও বলা চলে। কিন্তু যখন হাটে বাজারে "ফুলের পুটলি বান্ধে, সাজি ভরে ল'য়ে কান্ধে" মালীরা বেড়াইত, তখন যে দেশের লোকের মনে দারিদ্র্যের দাগা ছিল, তাহাও ত বোধ হয় না।

অদ্যকার বাঙালী শুধু কেরাণীর জাতি। স্বাধীন বাঙালী কিন্তু "সাত ডিঙ্গা সাজাইয়া" সিন্ধু'বক্ষ মন্থন করিয়া দিকে দিকে বাণিজ্য করিতে যাইত। শ্রীমন্ত

সিংহল যাত্রা করিবেন, ঘাটে তরণী সজ্জিতঃ—

"সাত খান ডিঙ্গা ভাসে ভ্রমরার জলে। গোঁজে বান্ধা সাত ডিঙ্গা লোহার শিকলে।" আর এই সব ডিঙ্গা গুলিও যেমন তেমন নহে ঃ—

* * * দীর্ঘে ডিঙ্গা শত গজ,
আড়ে গড়ে বিংশতি প্রমাণ।
মকর আকার মাথা, গজ মুক্তা বান্ধা,
মাণিকে করিল চক্ষুদান।"

খুল্লনার কথায় বোঝা যায় যে এক একখানি ডিঙ্গা কত বড় ঃ—

"যদি শত কারিগর, গড়ে এক বৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখান।"

বলিয়াছি স্বাধীন বাঙলার রূপ সম্পূর্ণ ভাবে দেখাইতে হইলে, সারা চণ্ডীকাব্য খানিই উদ্ধৃত করিতে হয়। তাহার প্রয়োজনাভাব। যিনি বাঙলাকে ভালবাসেন—তাঁহার প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়াই প্রশস্ত।

স্বাধীন বঙ্গের একটি বিশেষ বিষয়ের পরিচয় এখনও দেওয়া হয় নাই; তাহা হইতেছে স্বাধীন বাঙলার মানুষ। আর সে মানুষ অভিজাত, পণ্ডিত,

জ্ঞানী মানুষ নহে; সে মানুষ অতি সাধারণ—বরং সাধারণ অপেক্ষাও ছোট—অন্ত্যজ মানুষ। উচ্চশ্রেণীর লোক স্বভাবতঃই সৎ হইয়া থাকে; নিম্নশ্রেণীর লোকের চরিত্র পরিচয়েই জাতীয় শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম প্রভৃতির পরিমাপ হয়। একটা সজীব, সমুন্নত, সুসভ্য জাতির উচ্চ স্তর হইতে অতি নিম্ন অন্ত্যজ বর্ণ পর্য্যন্ত চরিত্রবান, শিষ্টাচারপরায়ণ হয়। জাতীয় সাধনা ততক্ষণ ঠিক জাতীয় হয় না, যতক্ষণ না তাহা জাতির সর্ব্বাঙ্গে বিসর্পিত হয়।

স্বাধীন বাঙলার সাধারণ মানুষগুলি পর্য্যন্ত চরিত্র-বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। তাহারা শিষ্টাচারী, সদাচার-সম্পন্ন, সৎগৃহস্থই ছিল। অতি নিম্নজাতি ব্যাধ পর্য্যন্ত কিরূপ বিশুদ্ধচরিত্র ছিল, চণ্ডীকাব্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। দেবী যখন ব্যাধ কালকেতুর গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন কালকেতু বলিতেছে ঃ—

"আমি কহি সত্য বাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী,
প্রবেশে উচিত হয় স্নান।
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,

এবং ঃ—

"শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে।"
* * * *
"চরণে ধরিয়া মাগি ছাড়গো নিলয়।"

ইহার অপেক্ষা বেশী চরিত্রবল, সমধিক ধর্ম্মভাবের পরিচয় আর কি দেওয়া যাইতে পারে !

আজ বাঙালীর বীর্য্য নাই, বীরত্ব পরিচয় নাই ; না থাকার জন্য বর্ত্তমানের বাঙালীই যে দোষী তাহা নহে ; দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙালী "স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছে" ; আপনার দুর্ব্বুদ্ধিতে আপনার পায়ে দাসত্ব শৃঙ্খল পড়াইয়াছে। এবং বাঙালীকে বাধ্য হইয়া বীরত্বকে পরিহার করিতে হইয়াছে।

স্বাধীন বাঙালী কিন্তু অনুপম সাহসী, দুর্ব্বার বীর। যেখানে বীর্য্য প্রকাশের আবশ্যক হইয়াছে, সেইখানেই তাহার শক্তি-দ্যুতি মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাঙালী একদিন অজয় নদের তীরে অর্দ্ধ-এশিয়াজয়ী শেকেন্দর সাহাকে প্রতিহত করিয়াছে এবং বহু যুদ্ধেই তাহাঁর জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে বক্ষ-রক্ত ক্ষরণ করিয়াছে। সে সবের পরিচয় দিতে হইলে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। তবে বাঙালী যে যুদ্ধ করিতে জানিত, চণ্ডীকাব্য হইতে তাহার একটু পরিচয় দিতেছি :—

"ফেলে অস্ত্র লোফে বীর, মারে মালসাট।
বিপক্ষ মারিতে বীর, জুড়িলেক কাট ॥"

রূপ ধ্যান সিদ্ধ। আজিকার বাঙালীকে স্বাধীন বাঙলার রূপ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শুধু ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আশ্রয় লইলেই চলিবে না, তাহাকে ধ্যানযোগে সে মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র "শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্" ও "বহুবল ধারিণীম্" জননীকে যেমন ধ্যানযোগে দর্শন করিয়া সে রূপ চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন, তেমনি করিয়া নূতন সাধককে স্বাধীন বাঙলাকে প্রত্যক্ষ-গোচর করিতে হইবে। মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া যেমন ইষ্টদেবতার স্বরূপ দর্শন করিতে হয়, তেমনি বিগত যুগের স্বাধীন বাঙলাকে পুরোবর্ত্তী রাখিয়া অনাগত দিনের স্বাধীন বাঙলার কথা ভাবিতে হইবে। সেইজন্য গত দিনের স্বাধীন বাঙলার রূপের কথা ভাবিতে হইবে —তাই গত দিনের স্বাধীন বাঙলার রূপের কথা বলিতেছি।

স্বাধীন বাঙলা ছিল পল্লীপ্রধান। পল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালীর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই পল্লী মাত্রেই ছিল শ্রীশালিণী, সৌষ্টব-সম্পদ বিভূষিতা। প্রত্যেক গ্রামেই স্বচ্ছসলিলা দীঘি, সরোবর, অন্ততঃ বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী থাকিত। গৃহগুলি সবই সুবিন্যস্ত

—পর্ণগৃহ হইলেও কারুতায় সুশোভিত। দেব-মন্দির ছিল—প্রতি পল্লীর একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। পথ ঘাট ছিল সুপরিষ্কৃত ; কেননা, শুচিতা বাঙালী জীবনের বিশিষ্ট সংস্কার। প্রায় প্রতি গৃহস্থেরই বহির্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপ রহিত। আর থাকিত পুষ্প-বাটীকা। আজ যেমন "এসেন্সে" কাজ চলিয়া যায়, তখন তেমন চলিত না ; কারণ দেব-পূজা নিত্যকর্ম্ম ছিল বলিয়া প্রত্যেকেই ফুলের বাগান করিতে হইত। ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্ব্বেও এই প্রকার বহু পল্লীর অস্তিত্ব ছিল। এখনও রাঢ়ের সুদূর প্রদেশে ঐরূপ দুই একখানি গ্রামের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

স্বাধীন বাঙলায় জীবনসংগ্রাম ছিল না। তাই তখনকার বাঙালীর অধিকাংশই গ্রামবাসী ছিল। ব্রাহ্মণ পূজা অর্চ্চনা, অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন, কৃষক কৃষিকর্ম্ম করিতেন, বণিক ব্যবসা করিতেন, শিল্পী তাঁহার শিল্পকার্য্যে রত রহিতেন ; কাহারও উদ্বেগ ছিলনা, অথচ কাজকর্ম্ম ছিল। আর এই সব কাজ দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধেই প্রায় শেষ হইত। বিলাস ব্যসন ছিলনা, কাজেই কৃত্রিম অভাব ছিলনা ; সকলে স্বাবলম্বী, স্বধর্ম্মসেবী, শিল্পী ও ব্যবসায়া ছিল, ফলে

অর্থ নৈতিক অনটন ঘটে নাই। প্রত্যেকেই অবসরে আনন্দ উপভোগ করিত। সে সব আনন্দও ছিল পবিত্র। কীর্ত্তন, কথকতা, কবি, পাঁচালী, যাত্রাগানও বারোয়ারীতে সে আনন্দ অভিব্যক্ত হইত। "বারো-মাসে তেরো পার্ব্বণ"—এই ছিল দেশের রীতি। যাহা কিছু একটা উপলক্ষ্য করিয়া বাঙালী তাহার অন্তরের প্রফুল্লতাকে বাহিরে প্রকাশ করিত।

অপরাহ্নে প্রৌঢ় ও বর্ষীয়ান্‌গণ একত্র মিলিত হইয়া নানা সদালাপে কাল কাটাতেন; এবং যুবক ও কিশোরেরা আখড়ায় লাঠিখেলা ও কুস্তি করিত। "চৈতন্য-মঙ্গল' ও "চৈতন্য ভাগবত" প্রভৃতি গ্রন্থে বাঙালী জীবনের সমগ্র আলেখ্য খানিই বেশ পরিস্ফুট। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে দেখি :—

"প্রতি দ্বারে শোভে অতি বিচিত্র কপাট।
প্রতি গলি নৃত্যগীত আনন্দিত, প্রতিঘরে বেদপাঠ॥"

বাল্যে আমরাও দেখিয়াছি যে, বৈকালে যুবক ও প্রৌঢ়গণ মিলিয়া লাঠিখেলা ও হাডু-ডুডু প্রভৃতি খেলিতেছেন, এবং সন্ধ্যায় দেবালয়ে গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ একত্রিত হইয়া কথকতা বা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেছেন।

স্বাধীন বাঙলার গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গাভী ছিল তাহার অন্যতম সৌষ্ঠব ও লক্ষ্মীশ্রী। প্রায় প্রতি বাঙালীরই গোময় লেপিত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে উঠানে গোলা ও মরাই শোভা পাইত; আর গোঠে গোঠে শ্যামলী ধবলী গাভী বিরাজ করিত। এই ধানের ও দুধের বলে স্বাধীন বাঙালীর দেহ মন বীর্য্যে ও আনন্দে পরিপুষ্ট হইয়াছিল।

স্বাধীন বাঙলার নিখুঁত চিত্র আঁকিতে হইলে, তাহার ঘর দুয়ার, উঠান প্রাঙ্গিনা, তাহার মাঠ ঘাট, মন্দির মঠ, তাহার হাট বাজার, ক্ষেত খামার, তাহার পূজা পার্ব্বণ, বিবাহ উপনয়ন অর্থাৎ তাহার জীবনের যাহা কিছু ছিল, সবেরই একটি একটি করিয়া পরিচয় দিতে হয়। বাঙালীর স্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা জাগিলে, তেমন রূপদক্ষ শিল্পী-সাধক আবির্ভূত হইবেন, এবং "মা যা ছিলেন" তাহা অঙ্কিত করিবেন।

আমার বক্তব্য "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর" এই গীত সাধক-বাঙালী গাহিয়া গিয়াছেন। আর বর্ত্তমান বাঙালী স্বাধীন বাঙলার জন্য সম্মিলিত কণ্ঠে গাহিবে না :—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"<br>
গুণে মন ভোর।"

এবং ঐ রূপ ও গুণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহার দেশভক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিবে না ?

করিবে। সেই জন্যই ত স্বাধীন বাঙলার কথা কওয়া।

স্বাধীন বাঙলার কথা এত করিয়া কহিলাম ; কারণ স্বাধীন বাঙলা ধ্বনিটিই যেন মৃত-সঞ্জীবনী ! স্বাধীন বাঙলা বলিলে রক্ত যেন বেগে প্রবাহিত হয়। বক্ষ যেন ফুলিয়া ওঠে ! জীবন গৌরব গর্ব্বে ভরিয়া যায় ! আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া যেন নবজীবন লাভ করি ! পরিশেষে স্বাধীন বাঙলার মহিমাময়ী মূর্ত্তির কাছে যুক্ত করে, অবনত শিরে এই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি :—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণা শরীরে।
—বন্দেমাতরম্।"